পায়ের ধূলো

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩২৫

দ্বিতীয় সংস্করণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কবিবর ও বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

করকমলেষু

পালা-সুরুর আগে

রাধারাণী ও মুকুলমালার কাহিনীর কতখানি আমার কল্পনা, আর কতখানি বাস্তব, এখানে তা স্পষ্টাস্পষ্টি নির্দেশ না ক'রে খালি এইটুকুই বলতে চাই যে, এই উপন্যাসের অনেক জায়গায় নিছক সত্য প্রায় অবিকৃত ভাবেই আছে। আমি যা দেখেছি, শুনেছি আর সম্ভব ব'লে মনে করেছি, তারই উপরে এই উপন্যাসের কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে। সামাজিক অন্যায়কে তুচ্ছ গোঁড়ামির মোহে আর বাক-চাতুরীর আড়ালে গোপন না রেখে আমি তা প্রকাশ ক'রে দিতে চাই। কাপড়-চাপা দিয়ে লুকানো থাক্‌লেও ফোঁড়া সারে না, সেজন্যে চিকিৎসার দরকার। এতে যদি নিন্দা হয়, তবে সে নিন্দাকে আমি মাথার মণি ক'রে রাখ্‌তে লজ্জিত নই। দেশের সাম্‌নে যে-সমস্যাকে আজ এগিয়ে দিলুম, সে সমস্যা যাঁরা পূরণ কর্‌তে ভীত নন তাঁরাও অগ্রসর হোন, পদস্পৃষ্ট ঘৃণাক্লিষ্ট মানবতা তাঁদেরই পথ চেয়ে এতদিন অপেক্ষা ক'রে আছে।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম ভাগ

পায়ের ধূলো

এক

সে পাড়ার গোলমাল সেদিন অসময়ে থেমে গেছে।

"চাই বেলফুল", "কুল্পী—মালাই-কা-বরফ", "[illegible] ঘুগ্নী", "মন্-মোহিনী চপ" "হাঁসের ডিম-সন্দেস" প্রভৃতি [illegible] ফিরি-ওয়ালারা আজ আর চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ ক'রে সেখান দিয়ে যাওয়া-আসা করছে না,—এমন-কি রাস্তায় একজন [illegible] পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না এবং বোধ করি জনহীন পথে মানুষ-শিকার করতে পারবে না ব'লেই হতাশ 'ট্যাক্সি-গাড়ী'গুলো পর্য্যন্ত যে যার আড্ডায় স'রে পড়েছে।

একটু আগে ভয়ানক একটা সোরগোল তুলে ঝড় উঠেছিল এবং তারই দাপটে রাজপথের উপর থেকে জীবনের সমস্ত চিহ্ন যেন মুছে গেছে। এলমেলো বাতাস এখনো ঘন-ঘন ঝাপ্টা মেরে, হু-হু ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে এবং সেইসঙ্গে বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে,—তেমন নিবিড় ধারা অনেকদিন দেখা যায়নি। পূর্ণিমার রাত,—তবু তার আভাসটুকু পর্য্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না, উপরের দিকে তাকালে খালি চোখে পড়ে—

বিশ্বব্যাপী বিরাট এক অন্ধকার যেন প্রকাণ্ড হাঁ মেলে এক ঢোঁকেই ঢক্ ক'রে গোটা পৃথিবীটাকে গিলে ফেল্‌তে চাইছে!

আলোকনাথ বন্ধুদের আসরে ব'সে রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-সঙ্গীত শুন্‌ছিল—এই বিষম দুর্যোগে সে যে আজ বাসায় ফির্‌তে পার্‌বে, এমন দুরাশা তার মোটেই ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল যে, তেতলায় পড়্‌বার ঘরের জান্‌লাগুলো সে আজ খুলে রেখে এসেছে! এই ঝড়ে-জলে তার ঘরময় ছড়ানো দামী বইগুলো আর দরকারি কাগজপত্রগুলোর অবস্থা এতক্ষণে যে কি শোচনীয় হয়ে উঠেছে, এ-কথা ভেবেই তার বুকটা বেজায় দমে গেল। একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সে বল্‌লে, "চল্লুম!"

বন্ধু বিমল চম্‌কে বল্‌লে, "সে কি হে, এই ঝড়-জলে! মা যে তোমার জন্যে নিজের হাতেই আজ লুচি ভাজ্‌চেন!"

—"আমার অসীম দুর্ভাগ্য, মায়ের নিজের হাতে ভাজা লুচি খাওয়া আমার এ দগ্ধোদরের ভাগ্যে ঘটবে কেন? পড়্‌বার ঘরের জান্‌লাগুলো খুলে এসেচি, আমাকে যেতেই হবে!"

—"কিন্তু যাবে কি ক'রে, তোমার গাড়ীও আনো নি, রাস্তায় এখন ভাড়া-গাড়ীও পাবে না যে!"

—"তাহ'লে হেঁটেই যাব।"

—"কিন্তু পথে যে এক-কোমর জল দাঁড়িয়েচে।"

"হাঁটতে না পারি, সাঁতরেও আমাকে আজ যেতে হবে।"

—"তবে একটু দাঁড়িয়ে যাও, একটা ছাতা এনে দি।"

—"এমন ঝড়-বৃষ্টিতে ছাতা! পাগল নাকি!"—এই ব'লেই আলোকনাথ হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে গেল এবং বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বল্‌লে, "মাকে বোলো আমার মুখের লুচি তুলে রাখ্‌তে। কাল সকালে এসে খেয়ে যাব, তাঁর হাতের অমৃত ব্যর্থ হতে দেব না!"

বিমল ঘরের অন্য বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললে, "আলো, আমার মাকে কি ভালোটাই বাসে! যেন নিজের মা। কিন্তু কথা শুন্‌লে না, এই দুর্য্যোগেই বেরিয়ে গেল, হয়তো ঠাণ্ডা লেগে অসুখে প'ড়বে।"

নরেশ বল্‌লে, "আলোর অসুখ! তুমি হাসালে বিমল! ও লোহার দেহে কোন অসুখই দাঁত বসাতে পারে না, আজ পনেরো বছর ওকে দেখ্‌চি, কখনো তো সামান্য সর্দ্দিতেও ভুগতে দেখ্‌লুম না।"

বিপিন বল্‌লে, "ও কি কম চেষ্টায় নিজের দেহকে গড়েচে! এখনো রোজ কুস্তি লড়ে, পাঁচশো ডন, হাজার বৈঠক দেয়, চার-মণ ওজনের বারবেল তোলে! বাঙ্‌লা দেশে ওর জুড়ী নেই!"

বন্ধুরা তার কথা নিয়ে এম্‌নি আলোচনা কর্‌ছে, ততক্ষণে আলোকনাথ অনেকখানি এগিয়ে পড়েছে। ঝোড়ো হাওয়া বইছে, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ঝর্‌ছে, পথ দিয়ে হু হু ক'রে জলস্রোত ছুট্‌ছে,—আলোকের কিন্তু কোনদিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই, বরং কল্‌কাতার একঘেয়ে পথ-চলায় আজ্‌কের এই নূতনত্বটুকু সে যেন প্রাণ ভ'রে উপভোগ কর্‌ছে এবং তার সুদীর্ঘ সবল দেহও যেন এই তিমিরান্ধ ঝঞ্ঝা-স্তম্ভিত রাত্রির রুদ্র-ছন্দের সঙ্গেই মানিয়েছে ভালো!

গোড়াতেই আমরা যে পল্লীর বর্ণনা করেছি, আলোকনাথ ক্রমে তার ভিতরে এসে ঢুক্‌ল। এখানে কোন ভদ্রলোক থাকেন না,—যারা থাকে, তারা সবাই বারবনিতা। বাসিন্দাদের মত যে পথটিরও জাত্‌ গিয়েছে! অন্যদিন হ'লে আলোকনাথ রাত্রে এ অঞ্চলে কখনোই ঢুক্‌ত না, কিন্তু আজ যে ঢুক্‌ল তার কারণ, সে রাস্তা দিয়ে শীঘ্র বাড়ী পৌঁছানো যায়।

পথের উপরে চোখ রেখে গুন্‌গুন্‌ ক'রে মেঘমল্লারে একটা গান গাইতে গাইতে আলোকনাথ নিজের মনেই এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে আশপাশের বাড়ী থেকে, বদ্ধ দরজা-জান্‌লা ভেদ ক'রে এলোমেল নাচ

গানের ধ্বনি ও মাতালদের বেতালা চীৎকার অস্পষ্ট হয়ে তার কাণে এসে ঢুক্‌ছে।

আচম্বিতে পাশের একখানা বাড়ীর সদর দরজাটা খুলে গেল এবং একটি রমণী দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যস্তভাবে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে।

আলোকনাথ অবাক্ হয়ে কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকাবামাত্র রমণী ব'লে উঠ্‌ল, "মশাই, মশাই, একটা পাহারাওলা ডেকে দিতে পারেন?"

আলোকনাথ তার কথার কোন জবাব না দিয়েই এগিয়ে চল্‌ল, সে বুঝ্‌লে, কোন গণ্ডগোল বেধেছে,—পাছে এখানকার কোন কুৎসিত হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়্‌তে হয়, সেই ভয়ে সে রমণীর কথা শুনেও শুন্‌লে না।

রমণী কিন্তু কাতর অনুনয়ের স্বরে বল্‌লে, "মশাই, আপনার পায়ে পড়ি, একটা পাহারাওলা ডেকে দিয়ে যান, নইলে গেরস্তের মেয়ের সর্ব্বনাশ হবে!"

আলোকনাথ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। গেরস্তের মেয়ে; সন্দিগ্ধস্বরে সে বল্‌লে, "কি হয়েচে, কি জন্যে পাহারাওলা ডাক্‌ব?"

রমণী তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "বেশী কথার সময় নেই, বাড়ীর লোক যদি টের পায় তাহ'লে আমার আর রক্ষে থাক্‌বে না। তারা এক ভদ্রলোকের মেয়েকে ধ'রে এনেছে, সবাই মিলে তার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করচে। এখন আপনি যদি দয়া ক'রে থানায় খবর দেন, কি একটা পাহারাওলা ডেকে দেন!"

হঠাৎ সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও বাড়ীর ভিতর থেকে নারী-কণ্ঠের একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ জেগে উঠ্‌ল।

রমণী বল্লে, "ঐ শুনুন। মশাই, আর দেরি করবেন—না—আর—"

কিন্তু তার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই পিছন থেকে মোটা মোটা ছুখানা কালো হাত বেরিয়ে এসে, রমণীর মুখ চেপে ধ'রে তাকে চকিতের মধ্যে বাড়ীর ভিতরে টেনে নিলে,—সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজাটাও ঝনাৎ ক'রে বন্ধ হয়ে গেল।

দুই

আলোকনাথ স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলে ভিজ্‌তে লাগল।

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে অনেক লোমহর্ষক ঘটনার কথা পড়া যায়, কিন্তু কল্‌কাতার বুকের উপরে যে এমন ব্যাপার সম্ভব, আলোকনাথ কখনো তা কল্পনাও কর্‌তে পারে নি।

কি করা কর্ত্তব্য? পাহারাওয়ালা ডাক্‌বে? কিন্তু কোথায় পাহারাওয়ালা? পথে যে জন-মানব নেই! থানায় খবর দেবে? সে যে অনেক দূর! তবে? আলোকনাথ নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে। বাল্যকাল থেকে সে শক্তি-সাধনা ক'রে এসেছে, বল-চর্চ্চাই তার ধ্যান-জ্ঞান! আজ এক অসহায়া নারীকে কি তার বলিষ্ঠ বাহু রমণী-জীবনের সব-চেয়ে বড় অপমান হ'তে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না? আজ যদি তা নিশ্চেষ্ট থাকে, তবে এ শক্তি-সাধনার সার্থকতা কি?…

আলোকনাথ দৃঢ়পদে সেই বাড়ীর বদ্ধ দ্বারের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। নিজের কোমরে-জড়ানো চাদরখানা খুলে, পাকিয়ে নিয়ে সে মাথায় আগে জড়িয়ে ফেল্‌লে,—আচম্‌কা কেউ লাঠি চালালে মাথাটা যাতে চোট্ থেকে কতকটা বেঁচে যায়!

দরজার কড়াটা সজোরে নাড়্‌তে নাড়্‌তে আলোকনাথ চেঁচিয়ে ডাক্‌লে, "বাড়ীর ভেতরে কে আছ, দর্‌জা খোলো দর্‌জা খোলো!"

একবার, দু-বার, তিনবার ডাকের পরেও ভিতর থেকে টুঁ শব্দটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না।

আলোকনাথ একবার দরজাটার দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখ্‌লে।

তারপর দরজার উপরে পিঠ রেখে সজোরে এক ধাক্কা মার্‌লে—ভিতরের খিলটা অম্‌নি মড়াৎ ক'রে ভেঙে দরজাটা দু-হাট হয়ে খুলে গেল!

ভিতরে একটা হারিকেন ল্যাম্প মিটমিট ক'রে জ্বল্‌ছিল, তারই আলোতে আলোকনাথ দেখ্‌লে, যে রমণী তাকে ডেকেছিল, তখনো তার মুখ চেপে ধ'রে একটা গুণ্ডার মতন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলোকনাথ বাড়ীর ভিতরে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই সেই লোকটা রমণীকে ছেড়ে বেগে তার দিকে ছুটে এল। আলোকও অম্‌নি হেঁট হ'য়ে পড়্‌ল।

লোকটা যেই তার হেঁট-হওয়া দেহের উপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌ল, অম্‌নি তার নীচের দিকটা চেপে ধরে আলোকনাথ বিদ্যুতের মতন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল—লোকটার দেহ একেবারে শূন্যে তুলে ধ'রে! তার পর চোখের পলক না পড়্‌তেই আলোক তার দেহটাকে মাটির উপরে সজোরে আছ্‌ড়ে ফেল্‌লে,—দু-চারবার গোঁ গোঁ ক'রেই লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেল।

আলোকনাথ ফিরে রমণীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। ভয়ে সে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপ্‌ছে। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বল্‌লে, "ও কি ম'রে গেল?"

—"না, অজ্ঞান হ'য়ে গেছে; আর মর্‌লেও কোন ক্ষতি ছিল না। এখন বল দেখি, যে গেরস্তের মেয়ের কথা তুমি বল্‌ছিলে, তিনি কোথায় আছেন?"

—"তেতলায়। কান্নার শব্দ পাচ্চেন না?"

হ্যাঁ, সত্যিই তো, উপর থেকে কার চাপা কান্নার আওয়াজ আসছে বটে! আলোকনাথের চওড়া বুকখানা বিষম রাগে ফুলে যেন দুগুণ হ'য়ে উঠ্‌ল, সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠ্‌তে গেল।

কিন্তু সেই রমণীটি তার একখানা হাত চেপে ধ'রে আকুলস্বরে বল্‌লে,

"যাবেন না, যাবেন না—আপনি একলা, তারা তিনজন। আগে পুলিশ ডেকে আনুন।"

—"তারা একশো জন হ'লেও ডরাই না—পুলিশ ডাক্‌বার সময় নেই। এত বড় আস্পর্দ্ধা, নারীর ওপরে অত্যাচার!" বলতে বলতে রমণীর হাত ছাড়িয়ে আলোকনাথ দ্রুতপদে উপরে উঠে গেল। রমণী কাঠের মতন সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল—কেবল একটা অস্ফুট আর্ত্ত কামনার স্বর আলোকের কাণে গিয়ে ঢুক্‌ল—"ভগবান রক্ষা করুন!"

যে ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আস্‌ছিল, সেই ঘরের সাম্‌নে এসে আলোক দেখ্‌লে, দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজায় কাণ পেতে সে শুন্‌লে, ভিতরে নারী-কণ্ঠে কে কাঁদ্‌ছে, আর কে একটা লোক কর্কশস্বরে ধমক্ দিয়ে বল্‌ছে, "তাহ'লে তুই তোর মায়া-কান্না থামাবি নে, না? তবে দাঁড়া, মজাটা টের পাওয়াচ্চি! বিশে, ধর্ তো ছুঁড়ীর গলা টিপে!"

কে অভাগী সক্রন্দনে ব'লে উঠ্‌ল, "ওগো, তাই কর গো, তাই কর! আমাকে গলা টিপে একেবারে মেরে ফেল! তাহ'লে আমি বাঁচি!"

বোধ করি, বিশেই বল্‌লে, "ভারি আব্দার যে! মেরে ফেল্‌ব! তার চেয়ে বল্‌না, সন্দেশ খাব। ওঁকে প্রায় মার্‌তেই এখানে আনা হয়েচে কিনা!"

আর একজন কে কোমলস্বরে বল্‌লে, "মুকুল, মুকুল! কেন তুমি এমন অবুঝ হ'চ্চ? শান্ত হও, কান্না থামাও! আর তো তোমার ফের্‌বার পথ নেই, আমার কথা শোনো, আমি তোমাকে রাণীর মতন রাখ্‌ব!"

উত্তরে সেই নারী আবার হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌তে গেল—কিন্তু কান্নার শব্দটা হঠাৎ থেমে পড়্‌ল, যেন কে তার মুখ জোরে চেপে ধর্‌লে!

একজন বল্‌লে, "আঃ, আচ্ছা কাঁদুনে মেয়েমানুষ এনেচ বাবু! হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল! ভালো কথায় এ বাগ্ মান্‌বে না, আজই এর

একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেল, নইলে কে কোথায় শুনতে পাবে, তখন আর রক্ষে থাকবে না! দিন-কাল ভারি খারাপ!"

আর একজন বললে, "হ্যাঁ, এমন বুনো মেয়েমানুষ জানলে কোন্ শালা এ কাজে হাত দিত! আজও যদি পোষ না মানে, তবে কালকেই আপদ বিদেয় ক'রে দেব!"

—"শুনচ মুকুল, এখনো কথায় কাণ দাও! নইলে আমাকে বাধ্য হয়ে জোর করতে হবে! শোনো, এই শেষবার তোমাকে অনুরোধ করচি!"

আলোকনাথ আর অপেক্ষা করলে না, ইতিমধ্যেই সে নিজের কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেলেছে। সে প্রস্তুত হয়ে দরজার উপরে আস্তে আস্তে দু-বার ধাক্কা মারলে।

ভিতর থেকে শোনা গেল, "কে রে, নিধে বুঝি? ঢ্যাখ্ তো বিশে, নিধে আবার কি বলে!"

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বিশে বললে, "কি রে নিধে, তুই আবার এ সময়ে জ্বালাতে এলি কেন?"

ক্রুদ্ধ দুটো অজগর সাপের মতন আলোকনাথের হাত দুখানা তীরবেগে বিশের গলার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পর-মুহূর্ত্তেই এক টানে তাকে সিঁড়ির উপরে আছড়ে ফেলে, আলোক তাকে এক ঝাঁকানি মেরে ছেড়ে দিলে;—বিশের দেহ গড়াতে গড়াতে সিঁড়িতে সিঁড়িতে ঠোক্কর খেয়ে নীচে নেমে গেল!

—"কি হ'লো রে, বিশে, প'ড়ে মরলি নাকি!"

আলোকনাথ একপাশে স'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

আর একটা লোক তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল এবং অমনি আচম্বিতে আত্মপ্রকাশ ক'রে আলোকনাথের নিষ্ঠুর বাহু দু'খানা তাকেও

ধ'রে অবিলম্বে সিঁড়িতে ঘোরপাক খাওয়াতে খাওয়াতে বিশের খোঁজে নীচে পাঠিয়ে দিলে!

ঝড়ের মত আলোকনাথ ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়্ল। তার সুমুখেই একজন লোক দাঁড়িয়ে,—চেহারা তার ভদ্রলোকের মত।

বিস্মিতস্বরে সে বল্লে, "কে তুমি?"

উত্তরে আলোকনাথ তার মুখের উপরে গোটাকয়েক 'মুষ্টি বৃষ্টি' কর্লে —আর্ত্তনাদ ক'রে লোকটা দু-হাতে মুখ চেপে মেঝের উপরে ব'সে পড়্ল —লোহার গোলার মত আলোকনাথের একটা ঘুসি গিয়ে পড়েছিল ঠিক তার [illegible]-চোখের উপরে!

ঘরের এক কোণে একটি নারী-মূর্ত্তি কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ মুড়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল।

আলোকনাথ বুঝে নিলে, এই অসহায়া নারীকেই উদ্ধার কর্তে হবে। তখন আর ভদ্রতা-প্রকাশের সময় ছিল না, সে তাড়াতাড়ি ব'লে গেল, "উঠুন, উঠুন, আমি আপনাকে বাঁচাতে এসেচি!"

ঘোম্টার ভিতর থেকে অবাক্ হয়ে সে অভাগী আলোকনাথের দিকে চেয়ে রইল—যেন এ-কথা বিশ্বাস কর্তেই পার্লে না।

আলোকনাথ অধীরস্বরে বল্লে, "এখনো বসে রইলেন! আর একটুও দেরি কর্লে আমিও বিপদে পড়্ব, আপনিও বাঁচ্বেন না! উঠুন, আমাকে বিশ্বাস করুন, এ লজ্জা-ভয়ের সময় নয়!"

রমণী তখনি দাঁড়িয়ে উঠ্ল। ঘরের মেঝে থেকে একটা হারিকেন লণ্ঠন তুলে নিয়ে আলোকনাথ বল্লে, "আসুন আমার সঙ্গে। আমার দেহে জীবন থাক্তে আপনাকে কেউ স্পর্শ কর্তেও পার্বে না।"—বল্তে বল্তে সে এগিয়ে গেল, রমণীও ভয়ে ভয়ে তার পিছনে চল্ল।

দ্বিতলের সিঁড়ির তলাতেই সেই দুটো লোকের অজ্ঞান দেহ পথ জুড়ে প'ড়ে রক্তে মাখামাখি হয়ে ছিল, তাই দেখে রমণী শিউরে উঠে ভয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আলোকনাথ একহাতে অত্যন্ত অনায়াসেই তাদের দেহ একে একে তুলে পথ থেকে সরিয়ে রেখে বললে, "আসুন। এ-সব দেখে ভয় পাবেন না।"

নীচে নেমেই আলোক দেখলে, যে রমণী তাকে ডেকেছিল, স্তব্ধ পুতুলের মত সে উঠানের উপরে ব'সে আছে।

আলোক বললে, "এখন তোমার দশা কি হবে? তুমিই যে আমাকে ডেকে এনেচ, এ বাড়ীতে তার সাক্ষী আছে। এখন তুমি বাঁচবে কি ক'রে?"

সে কিছু বললে না—উদাস চোখদুটি তুলে শুধু আলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—"তোমার নাম কি?"

মৃদুস্বরে সে বললে, "রাধারাণী।"

—"আচ্ছা, রাধারাণী, আপাতত আমার সঙ্গে যেতে তোমার আপত্তি আছে?"

রাধারাণী ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

—"তবে এস। পরে তোমার কথা ভাবা যাবে।"

কয়েক পা এগিয়েই আলোক দেখলে, সেই প্রথম লোকটা—বোধ হয় তারই নাম নিধি—হতভম্বের মত সদর দরজায় ঠ্যাসান্ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আলোকনাথ কর্কশ স্বরে বললে, "এই যে, তোর জ্ঞান হয়েচে দেখ্চি। বেশ এখন ভালো চাস্ তো আমার পথ ছেড়ে স'রে যা! এবার আমাকে বাধা দিলে তুই আর প্রাণে বাঁচ্বিনে—বুঝেচিস্?"

সে বিলক্ষণই বুঝেছিল। তাই আর উচ্চবাচ্য না ক'রে সদর দরজা খুলে, তাড়াতাড়ি স'রে পড়্‌ল।

আকাশ তখনো অন্ধকার, বৃষ্টি তখনো পড়্‌ছে, পথ তখনো জলে জলাকার।

রাস্তায় বেরিয়ে আলোকনাথ রমণীর দিকে ফিরে বল্‌লে, "পথ চল্‌তে আজ কষ্ট হবে, কিন্তু উপায় নেই।"

রাধারাণী বল্‌লে, "ও বাড়ীর চেয়ে এ পথও ঢের ভালো।"

আলোকনাথ ব্যঙ্গভরে বল্‌লে, "তবে তুমি ও-বাড়ীতে ছিলে কেমন ক'রে?"

লজ্জায় রাধারাণীর মাথা হেঁট হয়ে গেল। একটু থেমে, বেদনাবিদীর্ণ অস্ফুট স্বরে সে বল্‌লে, "আজ আপনি না এলে আর এক অভাগীকেও তো আমারি মতন ঐ বাড়ীতে থাক্‌তে হোতো!"

আলোকনাথ বুঝ্‌লে। না-জেনে এই নারীর গোপন ক্ষতে নির্দ্দয়ের মতন আঘাত দিয়েছে ব'লে নিজের উপরে নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। এতটা সে তলিয়ে দেখে নি।

তিন

"বঙ্গ-ব্যায়ামাগারে" তখন পুরোদমে ব্যায়াম চলছিল।

অনেকখানি জমি ;—তার খানিকটা খোলা, বাকি অংশের উপরে রাণীগঞ্জের টালির আচ্ছাদন দেওয়া। খোলা দিকটায় "প্যারালেল বার," 'হরাইজণ্ট্যাল বার" ও "রিং" প্রভৃতি জিম্‌নাষ্টিকের সাজ-সরঞ্জাম সাজানো। এখানে-ওখানে বড়-ছোট-মাঝারি বার-বেল, ডাম্বেল, 'কেট্‌ল্ বেল', 'রিং' ও মুগুর প্রভৃতি প'ড়ে আছে। আচ্ছাদিত অংশের এক-দিকে একটা কাঠের দেওয়াল ; তার গায়ে "ডভালপার", "চেষ্ট-এক্সপ্যাণ্ডার", রেঞ্জ্ গ্রিপ' ও মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানা প্রভৃতি ঝুলছে। একদিকে গোটা-তিন "পাঞ্চিং বল" ও ঘুঁসি মারবার জন্যে রবারের নর-মূর্ত্তি। কাঁচের প্রকাণ্ড দুটো আধারের মধ্যেও ভালো শিল্পীর হাতে-গড়া আরো দুটো প্রমাণ নর-মূর্ত্তি। তার একটার গায়ের চামড়া ছাড়ানো, ভিতরের সমস্ত মাংসপেশী ছাত্রদের দেখাবার জন্যে। অন্য মূর্ত্তিটাতে মাংসপেশীর তলায় মানুষের দেহে কোথায় কি আছে, তাই দেখানো হয়েছে। এক-পাশে মস্ত একখানা আয়না। ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজ্‌বার সময়ে দেহের মাংসপেশী কি ভাবে সঞ্চালিত হয়, ছাত্রেরা যাতে স্বচক্ষে তা দেখ্‌তে পায়, আয়নাখানা এখানে রাখা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই। দেওয়ালের অন্য পাশে ঘরের মেঝেতে মিহি ও নরম মাটি বিছানো, সেখানে কুস্তি হয়।

জমির একদিকে পুকুর,—সাঁতার-অভ্যাসের জন্যে। পুকুরের ঘাটের দু-পাশে দু'টি বিখ্যাত মূর্ত্তি,—ভেনাস্ ও অ্যাপলো। নর দেহের নিখুঁত আদর্শ কি, ছাত্রদের মনে যাতে সে-সম্বন্ধে এ ধারণা হয়, সেই জন্যেই এখানে এ দু'টি মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা।

এই চমৎকার ব্যায়ামাগারটি স্থাপন করেছে আলোকনাথ সেন এবং এজন্তে যে তার অনেক হাজার টাকা খরচ হয়েছে, দেখ্‌লেই তা বেশ বুঝা যায়। ব্যায়ামাগারটি যাতে একেবারে আধুনিক হয়, তাতেও সে কম চেষ্টা করেনি। এমনকি, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সম্বন্ধে বাজারে যত-রকম বই আর সাময়িক পত্রাদি পাওয়া যায়, সে-সবও কিনে এনে আলোকনাথ চার-চারটে বড় বড় আল্মারি ভর্ত্তি ক'রে রেখেছে।

বাঙালী যাতে মানুষের মতন মানুষ হয়ে ওঠে, আলোকনাথের জীবনের কামনা হচ্ছে তাই-ই। তার মতে, বাঙ্‌লা দেশে এখন কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্স ও রাজনৈতিক আন্দোলন করবার আগে, বাঙালীর দেহের ও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আধি-ব্যাধিতে, অত্যাচারে অনভিজ্ঞতায় এবং শারীরিক বল-চর্চ্চার অভাবে বাঙ্‌লা যে দিন-কে-দিন জীবন্ত মড়ার মুল্লুকে পরিণত হ'তে চলেছে, এটা সে স্পষ্টই দেখ্‌তে পেত। দেশের মানুষই যদি সব ম'রে যায় বা জীবন্মৃত হয়ে থাকে, তবে বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি ও স্কুল-কলেজ-য়ুনিভার্সিটি নিয়ে কি লাভ হইবে? এসব ইহলোকের সম্পদ তো প্রেতলোকে কোন কাজেই আস্‌বে না!

স্কুল-কলেজ থেকে রোজ যখন রক্তহীন বিবর্ণ মুখ নিয়ে জীর্ণ-শীর্ণ, কোলকুঁজো ছেলের দল বই বগলে ক'রে শ্রান্ত ভাবে বেরিয়ে আস্‌ত, চশ্‌মা-পরা, পাণ্ডুমুখ, জামা-কাপড়-পরাণো বাঁখারির মতন মেয়ের দলকে নিয়ে মেয়ে-বিদ্যালয়ের গাড়ী যখন পথ দিয়ে ছুটে যেত, তখন সেদিকে চেয়ে আলোকনাথের চোখ ছল্‌ছলে হয়ে উঠ্‌ত। সে ভাবত, হায়রে, এই হচ্ছে বাঙ্‌লার ভবিষ্যতের আশা-ভরসা, ভবিষ্যতের জনক ও জননী! না এদের কৃপায় ভবিষ্যতে যেসব সন্তান বাঙ্‌লার মাটিতে জন্মাবে, তাহারা হবে আরো কতটা অপূর্ব্ব!—এরা লেখাপড়া শিখ্‌ছে, তোলপাড় করতে চাইছে, বক্তৃতায় দেশোদ্ধার করতে অগ্রসর

হচ্ছে—কিন্তু এ চেষ্টা কতদিনের জন্যে? ত্রিশ বছরেই এরা রোগে ভুগে বুড়ো, অকেজো হয়ে পড়্‌বে—তখন এদের জীবন নিয়ে দেশের বা সংসারের কতটুকু লাভ হবে? এরা জানেনা, মনের উপরে দেহের প্রভাব কত বেশী!

তাছাড়া বিশ্বের বিপুল রাজপথে, জীবন-সংগ্রামের ভিতর দিয়ে পথ চল্‌বার যোগ্যতাই বা এদের কোথায়? যে সাহস, বীর্য্য, সহ্য-ক্ষমতা, আত্মরক্ষার শক্তি ভূতলে মানুষকে প্রধান ক'রে তোলে, তার কিছুই যে এদের মধ্যে নেই! এদের আছে সুধু সবুট পদাঘাতে চট্‌পট্‌ প্লীহা ফেটে মরবার বা লাথি খেয়ে খবরের কাগজে নির্লজ্জ আন্দোলন কর্‌বার কিংবা সবলের রক্তচক্ষু দেখলেই প্রথম সুযোগে পালিয়ে বাঁচ্‌বার অপরিসীম যোগ্যতা! এত-বড় বিদ্যার জাহাজ মগজে পূরে আজ এরা ধরাকে সরা দেখ্‌ছে, কিন্তু কালই হয়ত মূর্খ, নির্ব্বোধ কাবুলিওয়ালার হাতের একটি-মাত্র চড় খেয়ে অত্যন্ত অনায়াসে এরা মহাপ্রস্থানের পথ ধর্‌বে, হিষ্ট্রি-ফিলজফির কোন ডিগ্রীই তখন এদের প্রাণরক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না! এদের দ্বারা দেশোদ্ধার—স্বাধীনতা লাভ? অসম্ভব নিশার স্বপন।

"ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব-বেদুইন!"

দু-পায়ে দাসত্বের শিকল প'রেও, বারংবার পদাঘাতে মাটির তলায় লুটিয়েও যে জাতি নিজের দেহকে আগে সবল না ক'রে তুলে সেই পদাঘাতকারীর অনুগ্রহে এম-এ বি-এ পাস ক'রে, জাতিগত দাসত্বের উপরে ব্যক্তিগত দাসত্ব বা চাকুরী লাভের জন্যে লালায়িত, তার চেয়ে মরুভূমির ঐ আরব-বেদুইন, পাহাড়ের ঐ আফ্রিদী জাতি ঢের—ঢের বেশী শ্রেষ্ঠ! তারা মূর্খ হ'লেও কেউ তাদের লাথি মার্‌তে সাহস পায় না!

তারা এম-এ বি-এ পাশ-করা চাকুরে বা মহাপণ্ডিত না হ'লেও প্লীহা তাদের সহজে ফাটে না, আধি-ব্যাধিতে এমন অনায়াসে তারা জীবন্মৃত হয়ে পড়ে না। শত অপমানে এবং মানুষের ও রোগের কবলে অসংখ্য আঘাত পেয়েও বাঙালী কি নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে! এই নিশ্চিন্ততা আর নিশ্চেষ্টতা দাস-জাতির স্বভাবগত দোষ; তার অসীম পাণ্ডিত্যও এ দোষ থেকে তাকে মুক্ত করতে পারে না। এই দোষ দূর হ'তে পারে, একমাত্র শক্তিসাধনায়।

অতএব আলোকনাথ এইদিকেই তার সমস্ত মন ও চেষ্টাকে নিযুক্ত ক'রে রেখেছিল। অবশ্য এটা সে বিলক্ষণই জানত যে, এই কোটি কোটি পঙ্গু, দুর্বল, রুগ্ন ও অমানুষের জন্মক্ষেত্রে তার মত দু-চার জনের ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিশেষ কিছু ফল হবে না;—এদিকে সমগ্র জাতির একান্ত সাধনা চাই! কিন্তু তাই ভেবে হতাশ হয়ে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকাও তো মনুষ্যত্বের চিহ্ন নয়! "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে!" সব কাজেই আগে দু'-চার জন অগ্রসর হয়, তারপরে তাদের সফলতায় উৎসাহিত হয়ে, তাদের চলা পথে দলে দলে নূতন পথিক এসে দেখা দেয়।

আলোকনাথের চেষ্টায় ও আগ্রহে তার প্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামাগারে উৎসাহী যুবকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। আলোকের শৈশবেই তার পিতা-মাতা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। ভাই বোনও তার কেউ ছিল না। সে মানুষ হয়েছিল এক বিধবা মাসীর কোলে। তিনিও এখন পরলোকে। এখনো তার বিবাহ হয়নি, সুতরাং সংসারে সে একেবারে একলা। ভাগ্যে, তার অর্থসম্পত্তির অভাব নেই—নইলে আজ তাকে বড়ই অসহায় হয়ে থাকতে হোতো।

তবে অভিভাবক ও আত্মীয় স্বজনের অভাবে এক বিষয়ে তার যথেষ্ট

সুবিধা হয়েছিল। নিজের অগাধ বিষয়-সম্পত্তির সে স্বেচ্ছামত ব্যবহার কর্‌তে পার্‌ত—এদিকে তার সংসারে বাধা দিবার লোক কেউ ছিল না।

কিন্তু বাধা দিবার লোক কেবল নিজের সংসারেই থাকে না—বাহির থেকেও তাদের দেখা-পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ষোলোআনা। তাই বহু সহস্র মুদ্রাব্যয়ে আলোকনাথ যখন "বঙ্গব্যায়ামাগার" স্থাপন কর্‌লে এবং তার আহ্বানে পাড়ার ও বে-পাড়ার যুবকেরা যখন সেখানে এসে যোগ দিলে, তখন পল্লীর মোড়ল গঙ্গাধর ভট্‌চায্যি আরো জনকয়েক পুরো আর আধা প্রাচীনকে সঙ্গে ক'রে তার কাছে এসে বল্‌লেন, "বাবা আলোক, তোমার এ কি দুর্ব্বুদ্ধি?"

আলোকনাথ বল্‌লে, "আজ্ঞে ভট্‌চায্যি মশাই, আমার যে অনেকগুলি দুর্ব্বুদ্ধি আছে, আমি তা জানি। কিন্তু আপাতত কোন্ দুর্ব্বুদ্ধিটির জন্যে আপনাদের প্রশান্ত চিত্ত অশান্ত হয়ে উঠেচে, আমিও তা শোন্‌বার জন্যে রীতিমত প্রস্তুত আছি।"—বলা-বাহুল্য, পল্লীর এই বৃদ্ধগুলির উপরে কোনদিনই তার মন তুষ্ট ছিল না। কারণ সে জান্‌ত, এদের অধিকাংশেরই মন সংকীর্ণ, প্রাচীন, অসংস্কৃত কূপের মত; যুগযুগান্তের আবিলতা তার গণ্ডীর মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে; দম বন্ধ হবার ভয়ে মুক্ত আকাশের একটু খোলা বাতাসও সেখানে ঢুক্‌তে সাহস পায় না।

গোড়াতেই আলোকনাথের কথা কইবার ধরণ দেখে গঙ্গাধর অবশ্যই কিঞ্চিৎ ভড়্‌কে গেলেন। বুঝ্‌লেন গৌরচন্দ্রিকার প্রথমেই "দুর্ব্বুদ্ধি" কথাটা ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত হয়নি। কিন্তু সে ভাবটা গোপন ক'রে তিনি বল্‌লেন, "বাবা, আমরা সেকেলে লোক—তোমাদের কাছে "ওল্ড ফুল" ছাড়া আর কিছুই নই। তবে কিনা, আমরা যা বলি, তা তোমাদের ভালোর জন্যেই বলি,—অনেক কাল পৃথিবীতে বাস কর্‌ছি, অনেক কিছু

দেখে শুনে মাথার চুলগুলোও পাকিয়ে ফেল্লুম। কাজেই তেঁতো লাগ্লেও আমাদের কথা শুন্লে বোধ করি তোমাদের বিশেষ-কিছু অনিষ্ট হবে না।"

আলোকনাথ অধীর স্বরে বল্লে, "গঙ্গাধরবাবু, আপনাদের কথা হয়তো আমার ভাল লাগ্লেও লাগ্তে পারে—যদি ঐ গৌরচন্দ্রিকা বাদ্ দেন। ও-প্রথাটা আপনাদের চেয়েও সেকেলে, একালে একেবারেই অচল। আপনাদের কোন্ কথাটা আমি শুন্‌চি না, সেইটেই এখন সংক্ষেপে স্পষ্ট ক'রে ব'লে ফেলুন দেখি! আমার হাতে আরো অনেক কাজ আছে।"

গঙ্গাধর বল্লেন, "তুমি যে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা খরচ ক'রে একটা আখ্ড়া তৈরি করালে, তাছাড়া নানাদেশ থেকে পালোয়ান আনিয়ে তাদের পিছনেও রাশি রাশি টাকা ঢাল্‌চ, এটা কি ঠিক হচ্ছে? অথচ আমাদের হরি-সভা আর বারোয়ারিতে এক পয়সাও চাঁদা দাও না। বল, অপব্যয় হয়। কিন্তু এর বেলায় কি তোমার অপব্যয় হচ্ছে না?"

আলোক বল্লে, "হরি-সভা আর বারোয়ারিতে চাঁদা দিই না, তার কারণ আমার হরি-ভক্তি একবিন্দুও নেই, আর বারো ইয়ারের মধ্যেও এক ইয়ার হবার জন্যে আমার একটুও বাসনা নেই। আখ্ড়ায় টাকা খরচ কর্‌চি বটে, কিন্তু সে টাকা চাঁদা তুলে আনা নয়—টাকাও দস্তুরমত আমার, অপব্যয়ও আমার। এর জন্যে আপনাদের এতটা মাথাব্যথা কেন?"

একটু রেগে গঙ্গাধর বল্লেন, "মাথাব্যথার কারণ আছে। তুমি বড় লোক, তোমার সব খেয়ালই শোভা পায়। কিন্তু পাড়ার আর সকলেও তো তোমার মত নবাব নয়! পাড়ার ছেলেগুলোর মাথা খাবার চেষ্টা ক'রে তোমার লাভটা কি বাপু?"

আলোক বল্‌লে, "আপনাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে এ জীবনে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় অনেক জিনিসই খেয়েচি বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন মানুষের মাথা ভক্ষণ করেচি ব'লে তো স্মরণ হচ্চে না !"

অকস্মাৎ মুখমণ্ডলে ও কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার ক'রে গঙ্গাধর বল্‌লেন, "না, ঠাট্টা নয় আলোক ! তোমার কু-পরামর্শে ছোঁড়া-গুলোর মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে, তারা সব তোমার আখ্‌ড়ায় এসে কুস্তি, জিম্‌নাষ্টিক আর লাঠিখেলা নিয়ে মেতে আছে, এতে তাদের পড়া-শুনোর বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে, আমরা বল্‌লেও শুন্‌চে না।"

আলোক বল্‌লে, "আপনাদের ছেলেরা যদি অবাধ্য হয়, তাতে আমার কি হাত আছে ? যারা বাপ-মায়ের কথা শোনেনা, তারা আমার কথা শুন্‌বে কেন ? তবে এটা জেনে রাখুন, আমি তাদের কোনই কু-পরামর্শ দিইনি, বা লেখাপড়া বন্ধ কর্‌তেও বলিনি। বরং আমি তাদের ভালোর চেষ্টাই কর্‌চি। ব্যায়াম ক'রে, কুস্তি ল'ড়ে, লাঠিখেলা শিখে যাতে মনের সঙ্গে তাদের দেহও তৈরি আর নীরোগ হয়ে ওঠে, পথে-বিপথে তারা আত্মরক্ষা কর্‌তে পারে, দীর্ঘজীবী হয়, এই আমার মনের ইচ্ছে। এতে তাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে কেন ? বরং স্বাস্থ্য ভালো হ'লে পড়াশুনোও ভাল ক'রে কর্‌তে পারবে। এই সৎকার্য্যেই আমি অর্থব্যয় কর্‌চি। এতে বাধা দেওয়া আপনাদের অন্যায়। এতে শুধু তাদের উপকার নয়—জাতির উপকার, দেশের উপকার।"

গঙ্গাধর বল্‌লেন, "তোমাদের ও-সব বড় বড় কথা আমরা বুঝি না বাপু! কুস্তি-লাঠালাঠি শিখে পরে তারা কর্‌বে কি ? গুণ্ডা হবে, ীত হবে ? তার পর অপঘাতে মর্‌বে ?"

আলোক বিরক্ত স্বরে বল্‌লে, "গুণ্ডামি কি ডাকাতি কর্‌বার জন্যে ব্যায়াম-চর্চ্চা করা হয় না। অপঘাত-মৃত্যুর কথা যদি বলেন তবে আমার

মতে, চিরজীবন রোগে ভুগে, অথর্ব্ব হয়ে বিছানায় শুয়ে তিলে তিলে মরার চেয়ে, হঠাৎ একদিন অপঘাতে মরা ঢের বেশী সুখের, ঢের বেশী ভালো। কিন্তু যাক্ সে কথা। আমি বুঝেছি, আপনাদের অন্ধতা ঘুচাবার শক্তি আমার নেই—সুতরাং মিছে কথা-কাটাকাটি ক'রে লাভ কি? আসুন মশাই—প্রণাম!" এই ব'লে সে আর কোন কথার অপেক্ষা না রেখেই ঘরের ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

"বঙ্গ-ব্যায়ামাগারে"র ভিতরটা তখন মানুষের রকমারি দেহ-ভঙ্গিতে বিচিত্র হয়ে উঠেছিল। কোন কোন যুবা কোদাল নিয়ে আখ্ড়ার মাটি কোপাচ্ছিল, কেউ কেউ আর্সির সাম্নে দাঁড়িয়ে "গ্রিপ্-ডাম্বেল" আর "ডেভালপারে"র সাহায্যে ব্যায়াম অভ্যাস কর্ছিল, কেউ কেউ "বারবেল" আর মুগুর ভাঁজ্ছিল। "প্যারালেল বারে" "হরাইজণ্ট্যাল বারে" আর "রিং"এও অনেকে অনেক রকম কসরৎ দেখাচ্ছিল। জমিতে উপুড় হয়ে কেউ ডন দিচ্ছে, একটা খুঁটি দু-হাতে ধ'রে কেউবা বৈঠকের পর বৈঠক ক'রে যাচ্ছে।

পুকুরের জলেও সাঁতারুর অভাব নেই। ডাঙায় ব'সেও দুচারজন সাঁতার-না-জানা ছোক্রা 'সুইমিং মেসিন' নিয়ে সাঁতারের প্রাথমিক কসরৎ অভ্যাস কর্ছে! সমস্ত আখ্ড়াটি ভ'রে যে দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ উঠ্ছে, বাহির থেকেও তা স্পষ্ট শোনা যায়!

এই যে শিক্ষার্থীর দল, নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে তাদের সুন্দর

যৌবন আরো বেশী বিকসিত হয়ে উঠেছে। ভোরের প্রথম আলো তাদের সবল ও নিটোল দেহের উপরে পড়ে যেন পিছ্‌লে গড়িয়ে যাচ্ছে—তাদের সেই আলো-ছায়া-মাখা প্রায়-নগ্ন পুরন্ত দেহগুলি আদর্শ-রূপে লাভ কর্‌লে, যে কোন ওস্তাদ-ভাস্কর নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিত। তাদের হাতে-পায়ে-দেহে-ছন্দিত ও লীলায়িত গতির কি অপূর্ব্ব বিকাশ—ভাবে-ভঙ্গিতে বলিষ্ঠ সৌন্দর্য্যের কি মোহন মাধুর্য্য! বাঙ্‌লার পথ-বাটে মানুষের যে কদর্য্য ছায়ামূর্ত্তিগুলোকে চ'লে বেড়াতে দেখা যায়, তাদের সঙ্গে এদের কী আকাশ-পাতাল প্রভেদ! বাঙ্‌লার আব্‌হাওয়ায় সবল পুরুষত্বের, ভগবান-দত্ত রূপৈশ্বর্য্যের কি শোচনীয় অপমান হচ্ছে, চেষ্টা ও সাধনা কর্‌লে বাঙালী যে কি থেকে কি হ'তে পারে, আলোকনাথের এই ব্যায়ামাগারে এলে তা বুঝ্‌তে, এবং সে-বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ পেতে বিলম্ব হয় না।

অন্য অন্য দিন আলোকনাথ আখ্‌ড়ার চারিধারে ক্রমাগত ঘুরে বেড়াত, প্রত্যেক ছাত্রের কাছে গিয়ে উৎসাহের কথা বল্‌ত, দোষ ত্রুটি হ'লে তাও দেখিয়ে দিত। কিন্তু আজ সে-সব কিছুই কর্‌ছে না। একখানা টুলের উপরে চুপ্‌ ক'রে সে অন্যমনস্কের মত ব'সে আছে! মাহিনা-করা পালোয়ান ইয়াকুব খাঁ যখন তাকে ডাক্‌লে, "বাবুজী, বেলা বাড়্‌চে, এই বেলা ল'ড়ে নিন," তখনো সে উঠ্‌ল না, খালি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে, আজ তার লড়্‌বার ইচ্ছা নেই।

আসল কথা, কাল্‌কের সেই বিচিত্র ঘটনাটা তার সারা মনকে অধিকার ক'রে আছে। কাল্‌কের মার-পিটের কথা নিয়ে আজ সে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না—কিন্তু যে দুটি অসহায়া নারীকে সেই নরক-কুণ্ড থেকে সে উদ্ধার ক'রে এনেছে, নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছে, তাদের কি গতি কর্‌বে, তাই ভেবেই তার চিন্তিত মন কোথাও যেন আর

থই পাচ্ছে না। এখনো এই বিপন্না, সুন্দরী যুবতী দুটির অস্তিত্ব পাড়ার জনপ্রাণীও জানতে পারেনি, জানতে পারলে যে কল্পনা-রসিক পড়সীদের রসনা কত না বিচিত্র রূপকথা রচনায় অতি-ব্যস্ত হয়ে তাকেও ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলবে, এটাও সে বিলক্ষণই আন্দাজ করতে পারছিল। কাজেই লোক-জানাজানির আগেই এ-ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলবার জন্যেই তার মনটা আজ এমন চিন্তান্বিত হয়ে আছে।

চার

রাধারাণীর মুখে মুকুলমালার যে ইতিহাস আলোকনাথ শুনেছে, সংক্ষেপে তা এই :—

মুকুলমালার বাপের বাড়ীর আর শ্বশুরবাড়ী—দুইই কল্‌কাতায়। তার শ্বশুর-শাশুড়ী দুজনেই বর্ত্তমান। স্বামী ডাক্তারী ক'রে বেশ দু-পয়সা ঘরে আন্‌ছেন। তাঁর একটি ভাই আছেন, তিনিও রোজগারী উকীল। আসল কথা, ধনী না হ'লেও বেশ সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরেই তার বিবাহ হয়েছে। মুকুলমালার একটি খোকাও আছে, বয়স তার মোটে পাঁচ মাস।

স্বামীর সংসারে মনের সুখে ঘরকন্না কর্‌ছিল, কোনদিকেই তার কিছু অভাব ছিল না। স্বামীকে প্রাণের দেবতার মতন ভক্তি-যত্ন করত, স্বামীর তরফ থেকেও কোনদিন সে প্রেমের কৃপণতা অনুভব করে-নি। এমন-কি বন্ধু-মহলে তার স্বামীর নাকি "স্ত্রৈণ" ব'লে অত্যন্ত একটা অখ্যাতি পর্য্যন্তও রটে গিয়েছিল।

মুকুলমালার বাড়ীর সাম্‌নেই একখানা বড় ভাড়াটে বাড়ী ছিল, মফঃস্বল থেকে যুগলকিশোর ব'লে এক জমিদার এসে আজ ক'মাস সেই বাড়ীখানা ভাড়া নিয়ে আছে।

রোজ বৈকালে কাজকর্ম্মের অবসরে মুকুলমালা ছাদের উপরে গিয়ে একটু হাঁপ্‌ ছেড়ে আসত। কিন্তু সাম্‌নের বাড়ীখানার এই নূতন ভাড়াটিয়া আসার পর থেকেই এদিকে কিছু মুস্কিল বাধ্‌ল। প্রথম প্রথম সে লক্ষ্য করেনি, কিন্তু তারপরেই বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, সে ছাদে উঠ্‌লেই, সাম্‌নের বাড়ীর ছাদেও রোজই সেই জমিদার-বাবুটিরও আবির্ভাব হয়! খালি তাই নয়—মুকুলমালা যতক্ষণ ছাদে থাকত, সেই লোকটার

অসভ্য ইঙ্গিতপূর্ণ খর-দৃষ্টি তার মুখের উপর থেকে একবারও নড়্‌ত না। লোকটার এই অন্যায় ব্যবহার দেখে মুকুলমালা শেষটা বিরক্ত হয়ে ছাদে ওঠা বন্ধ ক'রে দিলে।

একদিন দুপুরবেলায় খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে, মুকুলমালা শুয়ে শুয়ে একখানা মাসিকপত্র পড়্‌ছে, এমন সময়ে তার বাপের বাড়ীর ঝী হরিদাসী "ওগো দিদিমণি, সর্ব্বনাশ হয়েচে গো" ব'লে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকে, মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়্‌ল।

মুকুলমালা ধড়্‌মড়িয়ে উঠে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি রে, অমন কর্‌চিস্ কেন, হয়েচে কি ?"

কপালে করাঘাত ক'রে হরিদাসী বল্‌লে, "সব্বনাশ গো সব্বনাশ !"

—"সর্ব্বনাশ কি রে ? কার সর্ব্বনাশ হোলো ?"

—"আর কার ! আমাদের কত্তাবাবুর !"

—"অ্যাঁঃ ! বাবার ?"

—"হ্যাঁগো দিদি, হ্যাঁ !"

—"ভালো ক'রে খুলে বল্ হরিদাসী, অমন আধখাম্‌চা ক'রে কথা বলিস্‌নে, আমার বুক কেমন কর্‌চে !"

—"ঐ যে মটরগাড়ী না যমের গাড়ী গো,—কল্‌কাতায় ভালা এক আপদ এসে জুটেচে—কত্তাবাবু রাস্তা দিয়ে আস্‌ছিলেন এমন সময়ে সেই মানুষ-খেকো গাড়ী কোত্থেকে ঝড়ের মত ছুটে এসে বাবুর বুকের ওপর দিয়ে চ'লে গেছে !"

মুকুলমালা শুনেই মাথা ঘুরে প'ড়ে গেল।

হরিদাসী বল্‌তে লাগ্‌ল, "ওগো দিদিমণি, সে কি রক্ত গো, যেন রক্তের নদী ! বাবুকে সবাই ধরাধরি ক'রে বাড়ীতে নিয়ে এসেচে, এখনো তাঁর সাড় হয়নি—এ-যাত্রা বাঁচ্‌লে হয় ! গিন্নিমা তো পাগলের মতন হয়ে

গেছেন! দাদাবাবু আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, তোমাকে নিয়ে যেতে। আমি একেবারে গাড়ী ভাড়া ক'রে এনেচি। কিন্তু তোমার শাশুড়ী তোমাকে যেতে দেবে তো?"

ইদানিং মুকুলমালার পিতার সঙ্গে তার শ্বশুরের কিছু মনোমালিন্য হয়েছিল। তার বাপের বাড়ীর কেউ আর এ-বাড়ীতে পদার্পণ কর্তেন না, তার শ্বশুরও তাকে আর বাপের বাড়ীতে পাঠাতেন না। কিন্তু বাপের এই অবস্থা শুনে মেয়ে কি স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে? মুকুলমালা তখনি উঠে প'ড়ে বল্‌লে, "চল্, আর দেরি করিস্‌নে, আমি এখুনি তোর সঙ্গেই যাব!"—এই ব'লে সে হরিদাসীর সঙ্গে তখনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে, গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ল,—পাছে বাধা দেন, সেই ভয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীর অনুমতির অপেক্ষা পর্য্যন্ত রাখ্‌লে না!

খানিকক্ষণ এ-রাস্তা সে-রাস্তা ক'রে গাড়ীখানা দাঁড়াল। গাড়ীর ভিতরে মুকুলমালা এতক্ষণ আচ্ছন্নের মতন চুপ ক'রে বসেছিল, বাপের কথা ছাড়া আর কিছুই তার মনে ঠাঁই পায় নি—না-জানি গিয়ে তাঁর কি দশাই দেখ্‌বে! গাড়ী থাম্‌তেই তার হুঁস্ হোলো; গাড়োয়ান যেই দরজা খুলে দিলে, সে অম্‌নি তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে, সামনের বাড়ীর দরজার দিকে তাকিয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল—একি, এ তো তার বাপের বাড়ী নয়! তবে কি গাড়োয়ান ভুল ক'রে—

কিন্তু মনের চিন্তা মনেই রইল—আচম্বিতে পিছন থেকে কে তাকে ধাক্কা মেরে সাম্‌নের দরজার ভিতরে ঠেলে ফেলে দিলে এবং মাটি থেকে সে ওঠ্‌বার আগেই দরজাটা দুম্ ক'রে বন্ধ হয়ে গেল।

হতভম্ব হয়ে সে উঠে ব'সে দেখ্‌লে, ঠিক তার সুমুখেই হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, সেই জমিদার যুগলকিশোর!

দেখেই আর্ত্তনাদ ক'রে মুকুলমালা ঘোম্‌টায় মুখ ঢেকে ফেল্‌লে।

যুগলকিশোর হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল—সে হাসি যেন বাজের আওয়াজ !

মুকুলমালা তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে প'ড়ে আকুল স্বরে ডাক্‌লে—"হরিদাসী, হরিদাসী !"

আবার হো হো হাসি হেসে যুগলকিশোর বল্‌লে, "হরিদাসী ! সে আর তোমার কথা শুন্‌বে না মুকুল ! আমার কাছে সে ঢের টাকা ঘুস্ খেয়েচে ! অনেক কষ্ট, অনেক খোঁজ নিয়ে তবে তোমাকে হাতে পেয়েচি—আজ থেকে তোমায় আমি মুকুটের মত মাথায় ক'রে রাখ্‌ব, আর কখনো নামাব না।" যুগলকিশোরের দু-দুটো তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, দু-দুটো তীব্র অগ্নিশিখার মত ঘোম্‌টা ফুঁড়ে যেন মুকুলমালার মুখের উপরে জ্বালাময় স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল। সে তখনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত, কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে আপনার চেতনাকে জাগিয়ে রাখ্‌লে !

যুগলকিশোর বল্‌লে, "আর এখানে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা কর্‌চ কেন, চল ওপরে চল।" এই ব'লে সে মুকুলমালার হাত ধর্‌তে এল।

মুকুলমালা পিছিয়ে গিয়ে বল্‌লে, "সরে যাও, দরজা খুলে দাও, নৈলে আমি চ্যাচাব !"

যুগলকিশোর বল্‌লে, "তাহ'লে জোর ক'রে তোমার চ্যাঁচানি বন্ধ ক'রে দেব। আমরা পুরুষমানুষ, জোরে তোমরা আমাদের এঁটে উঠ্‌তে পারবে না তো !"

হঠাৎ পিছন থেকে মেয়ে-গলায় কে ব'লে উঠ্‌ল, "না, জোরে আমরা তোমাদের এঁটে উঠ্‌তে পার্‌বনা বটে ! তোমরা পুরুষমানুষ—ভারি বীর ! মেয়েদের পায়ে থ্যাঁৎলানোই তোমাদের পুরুষত্বের চিহ্ন !"

ঘোম্‌টার ফাঁক দিয়ে মুকুলমালা দেখ্‌লে, এই কথা বল্‌তে বল্‌তে একটি যুবতী তার দিকে এগিয়ে এল।

যুগলকিশোর বিরক্ত স্বরে বল্‌লে, "রাধারাণী, তুমি এ গোলমালে কেন?"

তিক্ত স্বরে রাধারাণী বল্‌লে, "আমি এই গোলমালে কেন? তাও আবার জিজ্ঞেস কর্‌চ! জাননা, তোমাদের বীরত্বে আমিও যে হার মেনেচি! এখন এই গোলমালের মধ্যেই আমাকে সারাজীবন কাটাতে হবে যে!"

যুগলকিশোর থতমত খেয়ে বল্‌লে, "রাধারাণী, তুমি আমাকে দুষ্‌চ কেন? আমি তো তোমার এ-দশা করিনি।"

রাধারাণী বললে, "তুমি করনি, কিন্তু তুমিও পুরুষ! পুরুষকে আমি বিশ্বাস করি না। সব বাঘই মানুষ খায়। তুমিও যে খাও, তার জলন্ত প্রমাণ এই তো সাম্‌নেই রয়েচে!"

যুগলকিশোর বল্‌লে, "দ্যাখো, এ আবার কি ঝামেলা লাগালে। —ওরে নিধে, শিগ্‌গির নেমে আয়!"

উপর থেকে সাড়া এল—"যাই!"

মুকুলমালার হাত ধ'রে রাধারাণী কোমল স্বরে বল্‌লে, "ভাই, কপাল-দোষে খাঁচার ভেতরে যখন এসে পড়েচ, তখন আর উপায় নেই। এখন ওপরে চল,—নইলে এবাড়ীর বীরপুরুষগুলি তোমাকে জোর ক'রে ধ'রে টেনে নিয়ে যাবেন!"

পাঁচ

আলোকনাথ ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখ্‌লে, মুকুলমালা মেঝেতে লুটিয়ে ফুলে ফুলে চাপা-কান্না কাঁদ্‌ছে, আর তার পাশে বসে রাধারাণী মৃদুস্বরে সান্ত্বনার কথা বল্‌ছে।

তাকে দেখেই মুকুলমালা তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে মুখে ঘোম্‌টা টেনে দিলে।

আলোকনাথ দরদ-ভরা স্বরে বল্‌লে, "আমার সারা বাড়ীখানা আপনি যে চোখের জলে ভিজিয়ে তুল্‌লেন! আমার বাড়ীতে এত দুঃখের অশ্রু আর তো কখনো পড়েনি!"

রাধারাণী বল্‌লে, "কিন্তু চোখের জল থামার কি উপায় কর্‌বেন বলুন দেখি!"

আলোকনাথ বল্‌লে, "সেইজন্যেই তো এসেচি। কিন্তু উনি কান্না বন্ধ না কর্‌লে কিছুই তো হবে না। খালি তাই নয়, এখন চুপ ক'রে থাক্‌লেও চল্‌বে না—ওঁকে আমার কথার জবাব দিতেও হবে। এ লজ্জার সময় নয়—এখন লজ্জা কর্‌লে ওঁরই ক্ষতি। যদিও উনি কাল্‌কের আগে আমাকে চিন্‌তেন না, তবু জেনে রাখুন, ভগবান সাক্ষী, উনি আমার বোন, আমি ওঁর ভাই! আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌চি, ওঁর মঙ্গলের জন্যে প্রাণপণ কর্‌ব!"

সে গম্ভীর প্রগাঢ় স্বর, আন্তরিক মমতা-ভরা কথা মুকুলমালার মনের ভিতরটা পর্য্যন্ত পরম সান্ত্বনায় আশ্বস্ত ক'রে তুল্‌লে। সত্য কথা বল্‌তে কি, মাঝে মাঝে এমন চিন্তাও তার মনে আস্‌ছিল, এই লোকটি তাকে সর্ব্বনাশের গর্ত্ত থেকে টেনে এনেছে বটে, কিন্তু হয়তো এর কাছেও সে

নিরাপদ নয়, হয়তো এক বিপদ থেকে সে আর এক নূতন বিপদে এসে পড়েছে। তা ছাড়া বাঙালীর মেয়ে সে, বিয়ে হবার পর থেকে লজ্জা ক'রে ক'রে লজ্জাটাই তার স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে,—সূর্য্যের আলোয় গায়ের উপর দিয়ে উড়ন্ত পাখীর ছায়া চ'লে গেলেও যে বঙ্গ-কুলবধূর সর্ব্বাঙ্গ চকিতে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে!

কিন্তু এখন লজ্জা করলে সত্যই সর্ব্বনাশ! বিশেষ এই সম্বোধনের, এই ভ্রাতৃত্ব-স্বীকারের পরেও! আলোকনাথের সপ্রতিভ চেহারায়, সরল মুখে ও অসঙ্কোচ কথাবার্ত্তাতেও এমন একটা আত্মীয়তার, মিষ্ট স্বভাবের আভাস পাওয়া যেত, যাতে ক'রে তার সংস্পর্শে এলে তাকে অবিশ্বাস করা বা পর ভেবে তফাতে রাখাও শক্ত হয়ে উঠ্‌ত। খানিক ইতস্তত ক'রে, মুকুলমালা তার ঘোম্‌টাটি একটু কমিয়ে, মৃদুস্বরে বল্‌লে, "আমার কি গতি হবে!"

আলোকনাথ বল্‌লে, "আমি যখন ভার নিয়েচি, গতি একটা করবই! তবে কি করলে সেই গতিটা দুর্গতি হয়ে না দাঁড়ায়, এখন তাই নিয়েই ভাবনা!"

রাধারাণী বল্‌লে, "আমাদের সমাজকে আমি চিনি—বড় নিষ্ঠুর, একচোখো সে! আপনারা পুরুষ, সমাজের বিষদাঁতের ধার আপনারা জানেন না। কিন্তু আমি তাকে জানি! পুরুষ তার বুকের দুলাল, সয়তান হ'লেও সে সমাজের স্নেহ হারায় না। কিন্তু আমরা নারী, অজান্‌তে একবার যদি পা হড়্‌কে প'ড়ে যাই, সমাজ তাহ'লে আর আমাদের ওঠ্‌বার দ্বিতীয় সুযোগও দেয় না।"

আলোকনাথ অত্যন্ত অবাক্ হয়ে খানিকক্ষণ রাধারাণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বল্‌লে, "রাধারাণী, কাল প্রথমে তোমাকে আমি সামান্য স্ত্রীলোক ব'লে মনে করেছিলুম! কিন্তু তারপর যতই তোমার

কথা শুন্‌চি, ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। কে তুমি? কেন তোমার এ দশা? তোমার কথা শুনে বেশ বুঝ্‌চি, তুমি অজ্ঞান নও—অশিক্ষিত নও! তবে এ-পথে তুমি কেমন ক'রে এলে—কেন এমন ভুল কর্‌লে, যে ভুল জীবনে আর সোধ্‌রাতে পার্‌বে না?"

রাধারাণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, "আমার কথা শুন্‌লেও আপনি বিশ্বাস কর্‌বেন না।"

আলোকনাথ বল্‌লে, "আমি বিশ্বাস কর্‌ব।"

রাধারাণী একটু বিরক্ত স্বরে বল্‌লে, "আলোকবাবু, আমি তো অকূলে ভেসেচিই, আমার আর কোনই আশা নেই! আজ ভাস্‌তে ভাস্‌তে এখানে এসে ঠেকেচি, কাল আবার স্রোতের মুখে আবার কোথায় চ'লে যাব—জ্যান্ত শবের মতন। আমার কথা নিয়ে কেন আপনি মাথা ঘামাচ্চেন? সাম্‌নে আপনার বিপন্ন স্ত্রীলোক, এখন কি আপনার গল্প শোন্‌বার সময়?"

আলোকনাথ লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, "সত্যি, আমার এ অন্যায় আগ্রহ। মাপ করো।"

রাধারাণী বল্‌লে, "এঁর কি উপায় কর্‌বেন, ভেবে দেখুন।"

আলোকনাথ চিন্তিত মুখে বল্‌লে, "তাই তো ভাব্‌চি।"

মুকুলমালা এখনো মুখ তুলে আলোকনাথের মুখের দিকে তাকাতে পার্‌লে না। রাধারাণীর দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বল্‌লে, "আমাকে নিয়ে ভাব্‌বার কোন দরকার নেই। আমি বাড়ী যাব।"

রাধারাণী বল্‌লে, "কিন্তু বাড়ীতে তুমি আর ঠাঁই পাবে কি?"

ব্যাকুল কণ্ঠে মুকুলমালা বল্‌লে, "কেন ঠাঁই পাব না,—কি দোষ আমি করেচি? ওরা ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে বাড়ীর বাইরে এনেচে বটে কিন্তু আমি তো এখনো পতিতা হইনি!"

—"কিন্তু বোন, আজ তিনদিন তুমি বাড়ীর বাইরে আছ। কারুকে না ব'লে তুমি চ'লে এসেচ—কোলের খোকাটিকে পর্য্যন্ত সঙ্গে আনোনি। বাড়ীর লোক তোমাকে এখন কি ভাব্‌চে, তা কি বুঝ্‌তে পার্‌চ না?"

—"যা ভাব্‌চে, ভুল ভাব্‌চে। আমি গিয়ে সে ভুল ভেঙে দেব।"

—"তোমার কথায় বিশ্বাস কর্‌বে কেন?"

মুকুলমালা প্রাণের আবেগে আলোকনাথের অস্তিত্বের কথা ভুলে গেল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে ব'লে উঠ্‌ল, "কেন বিশ্বাস কর্‌বে না,—কর্‌বে, কর্‌বে, কর্‌বে! ওগো, তুমি আমার স্বামীকে জানো না. বাড়ীতে যতক্ষণ থাকেন, আমাকে একদণ্ড চোখের আড়াল কর্‌তে পারেন না—আমাকে কত ভালোবাসেন তিনি! আমাকে তিনি চেনেন, আমি যদি তাঁর পায়ের তলায় প'ড়ে সব কথা তাঁকে খুলে বলি, তবে তিনি নিশ্চয় বিশ্বাস কর্‌বেন, নিশ্চয় বিশ্বাস কর্‌বেন!"

স্বামীর প্রতি অভাগীর অটল বিশ্বাস দেখে রাধারাণীর চোখে জল এল —এই বিশ্বাসের মূলে কতখানি শ্রদ্ধা-প্রেমের পবিত্র অর্ঘ্য আছে! এমন গভীর বিশ্বাসকে সে আর সন্দেহের বাড়ি মেরে ভেঙে দিতে পার্‌লে না, স্নেহভরে মুকুলমালার একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে দরদ-মাখা স্বরে রাধারাণী বল্‌লে, "তাই যেন হয় ভাই, তাই যেন হয়! আমি—" বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ থেমে প'ড়ে মুকুলমালার হাত ছেড়ে দিয়ে সে একটু সঙ্কুচিত হয়ে স'রে বস্‌ল। নিজের জীবনের কথা তার মনে পড়্‌ল,—এ দেবপূজার নৈবেদ্যের মত পবিত্র দেহ স্পর্শ কর্‌বার তার কি অধিকার আছে?

রাধারাণীর সঙ্কোচ আলোকনাথের চোখ এড়ালো না। তার অনুতপ্ত হৃদয়ের গোপন হাহাকার সে যেন নিজের কাণে শুন্‌তে পেলে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললে, "তাহ'লে এই কথাই ভালো। আজই সন্ধ্যার সময়ে আপনাকে আমি নিয়ে যাব, আপনার স্বামী শিক্ষিত পুরুষ, সকল কথা শুনলে তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে ক্ষমা করবেন। এ বিশ্বাস আমারও আছে।"

মুকুলমালা বললে, "সন্ধ্যার সময়ে কেন, এখুনি চলুন না। আমি যে আর সইতে পারছি না।"

আলোকনাথ বললে, "আমি তা জানি। কিন্তু দিনের বেলায় সবাই টের পাবে। আপনি যে আমার বাড়ীতে আছেন, এ আমি আর কারুকে জানতে দিতে চাই না।"

রাধারাণী বললে, "হ্যাঁ, সন্ধ্যের সময়েই ভালো। তোমার সঙ্গে আমিও এখান থেকে বিদায় হয়ে যাব!"

আলোকনাথ বললে, "তুমি! তুমি কোথায় যাবে? আবার সেই নরক-কুণ্ডে গেলে তুমি তো প্রাণে বাঁচবে না!"

—"না, সেখানে যাবার আর উপায়ও নেই, ইচ্ছেও নেই।"

—"তবে?"

—"আলোকনাথবাবু, এত বড় দুনিয়ায় আমি কতটুকু ক্ষুদ্র প্রাণী! আমার জন্যে আপনি ভাববেন না। ঝড়ের মুখে এমন কত ধূলোর কণা উড়ে যায়—কে তাদের খোঁজ রাখে?"

আলোকনাথ রাধারাণীর সামনে এসে পরিপূর্ণ স্বরে বললে, "না, রাধারাণী, তুমি যেও না।"

রাধারাণী একটু বিস্মিত হয়ে বললে, "তবে কি করব? আপনার এখানে তো আমার থাকা হবে না। লোকে কি বলবে?"

আলোকনাথ বললে, "আমার এখানে তোমাকে আমি থাকতে বলছিও না। বুঝছি, পাপে তোমার ঘৃণা আছে,—মন তোমার অনুতপ্ত।

আমি তোমার এমন ব্যবস্থা করতে চাই, যাতে তোমার গায়ে আর পাপের আঁচ্‌টুকু পর্য্যন্ত লাগ্‌তে না পায়।"

রাধারাণী বল্‌লে, "এমন কি ব্যবস্থা আছে আলোকবাবু?"

আলোকনাথ বল্‌লে, "তা এখন জানি না। দু-দিন ভাব্‌তে দাও, ভেবে ঠিক করব। উপস্থিত এঁর ভাব্‌না নিয়েই মনটা অস্থির হয়ে আছে, এঁর সম্বন্ধে আগে নিশ্চিন্ত হই।"

ছয়

সন্ধ্যা যখন উৎরে গেছে, আলোকনাথের মোটরগাড়ী মুকুলমালার শ্বশুরবাড়ীর সুমুখে এসে দাঁড়াল। আলোকনাথ "সোফার"কে পর্য্যন্ত সঙ্গে নেয়-নি, গাড়ী চালাচ্ছিল নিজের হাতেই।

গাড়ী থামিয়ে নেমে প'ড়ে, বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে আলোকনাথ ডাক্‌লে, "বাড়ীতে কে আছেন?"

পাশের বৈঠকখানা থেকে একটি লোক বেরিয়ে এলেন। বয়স তাঁর ষাটের কম হবে না। জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কাকে খুঁজচেন মশাই?"

"এ বাড়ীর কর্ত্তাকে।"

—"আমিই এ-বাড়ীর কর্ত্তা।"

—"আপনার নাম জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি?"

—"শ্রী রামপ্রাণ মজুমদার। আমার কাছে আপনার কি দরকার?"

—"আপনার পুত্রবধূ এসেচেন।"

—"আমার পুত্রবধূ!"—রামপ্রাণবাবুর মুখ মড়ার মত হল্‌দে হয়ে গেল।

—"হ্যাঁ, এই দেখুন।"—আলোকনাথ গাড়ীর দরজা খুলে দিতেই মুকুলমালা কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে নেমে এসে "বাবা গো" ব'লে কেঁদে উঠে, রামপ্রাণবাবুর পায়ের উপরে লুটিয়ে পড়্‌ল। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রইলেন - তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই ফুট্‌ল না।

আলোকনাথ মুকুলমালার উদ্দেশে বল্‌লে, "এখানে গোলমাল কর্‌বেন না, আপনি বাড়ীর ভেতরে যান।"

ততক্ষণে বিস্ময়ের ধাক্কাটা সাম্‌লে নিয়ে রামপ্রাণ গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন, "না, না, ওকে আর বাড়ীর ভেতরে যেতে হবে না!"

আলোকনাথের বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। সে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের হাত ধ'রে বল্‌লে, "রামপ্রাণবাবু, অবুঝের মত কাজ কর্‌বেন না। উনি আগে বাড়ীর ভেতরে যান, ততক্ষণে আমি আপনাকে গোটাকতক কথা ব'লে নি, তারপর আপনার কর্ত্তব্য, আপনি কর্‌বেন!"

মুকুলমালা টল্‌তে টল্‌তে বাড়ীর ভিতরে চ'লে গেল।

রামপ্রাণ সন্দেহের চোখে আলোকনাথের আগা-পাশ-তলা দেখে নিয়ে বল্‌লেন, "কে আপনি? কি বল্‌তে চান?"

"ঘরের ভেতরে চলুন"—ব'লে বৃদ্ধের সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই আলোকনাথ বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকে, একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়্‌ল।

বিরক্ত মুখে অত্যন্ত নারাজের মত রামপ্রাণও ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, "আমার পুত্রবধূ আপনার সঙ্গে কেন?"

আলোকনাথ বল্‌লে, "আমি ত সেই কথাই বলতে চাই।" কোনরকম ভূমিকা ফাঁদা তার অভ্যাস ছিল না—সে যা বল্‌ত, যা কর্‌ত,—স্পষ্টাস্পষ্টি সোজাসুজি। আজও তাই একটুও ইতস্তত না ক'রে মুকুলমালার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আগাগোড়া সে ব'লে গেল, একটি কথাও পল্লবিত বা অতিরঞ্জিত করলে না।"

সমস্ত শুনে রামপ্রাণ স্তব্ধ হয়ে চিন্তিত মুখে ব'সে রইলেন।

আলোকনাথ বল্‌লে, "এখন আপনি কি কর্‌তে চান? মনে রাখ্‌বেন, আপনার মুখের কথার উপরে একটি নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক নারীর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্‌চে।"

রামপ্রাণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বল্‌লেন, "উপায়

নেই! এ বৌকে আমি আর ঘরে নিতে পারব না—কিছুতেই না! আমি যদি একে ক্ষমা করি, তাহ'লে সমাজ আমাকে রক্ষা করবে না!"

আলোকনাথের মুখ শুকিয়ে গেল। ক্ষুব্ধ স্বরে সে বললে, "কিন্তু সমাজের কাছে কি মনুষ্যত্বের কোনই দাবি নেই? ভেবে দেখুন মশাই, ভেবে দেখুন!"

কঠিন হাস্য ক'রে রামপ্রাণ বললেন, "ও-সব বড় বড় কথা কেতাবেই লেখা থাকে, তা নিয়ে সংসার করা চলে না।"

আলোকনাথ বললে, "আপনার পুত্রকে ডাকুন, দেখি তিনি কি বলেন! তিনি তাঁর ধর্ম্মপত্নীকে নিশ্চয়ই ত্যাগ করতে পারবেন না!"

রামপ্রাণ ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, "সে তার পরদিনই বিবাগী হয়ে কোথায় চ'লে গেছে!"

—"চ'লে গেছেন! কেন?"

—"মনের দুঃখে, লোকলজ্জার ভয়ে! ঐ সর্ব্বনাশীর জন্যে আমার মানসম্ভ্রম গেল, সুখের সংসার নষ্ট হয়ে গেল। আমি ওকে বিশ্বাস করি না—আপনার কথাও আমি বিশ্বাস করি না, আপনার ও রচা কথায় অন্য কেউও বিশ্বাস করবে না! সীতাকেও অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়েছিল—আপনার কথার প্রমাণ কি?"

আলোকনাথ বৃদ্ধের কথা শুনতে শুনতে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনি প্রমাণ চান,—প্রমাণ? তাহ'লে এইখানেই একটু অপেক্ষা করুন,—আমি এখনি এক জলন্ত প্রমাণ এনে দেবার চেষ্টা করব!" এই ব'লেই দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রামপ্রাণ আশ্চর্য্য হয়ে নিজের মনেই বললেন, "কে এ লোকটা! দেখলে তো বড় ঘরের ছেলে ব'লেই মনে হয়! আর প্রমাণ আনবে ব'লে

এমন পাগলের মত গেলই-বা কোথায়? নিজের দুঃখ-লজ্জাই সাম্‌লাতে পার্‌চি না, কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দিতে এরা আবার কোথেকে এসে হাজির হোলো!"

দরজার বাইরে ভারি ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্ত্তেই রামপ্রাণ বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখ্‌লেন, দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল আলোকনাথ—তার কাঁধের উপরে একটা মানুষের দেহ ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে!—ঠিক একটা শিশুর মতই সেই দেহটাকে দু-হাতে শূন্যে তুলে আলোকনাথ দড়াম্‌ ক'রে তাকে ঘরের মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে! মাটিতে প'ড়েই সে কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল!

রামপ্রাণ সবিস্ময়ে বল্‌লেন, "একি, এ কী ব্যাপার!"

আলোকনাথ বল্‌লে, "আপনি প্রমাণ চাইছিলেন না? এই নিন্‌ প্রমাণ! চিন্‌তে পার্‌চেন, এ আপনার প্রতিবেশী, এরই নাম যুগল-কিশোর! রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল—এই ঘর থেকেই আমি একে দেখ্‌তে পেয়ে ধ'রে এনেচি!"

যুগলকিশোর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে আর্ত্তস্বরে বল্‌লে, "আমাকে খুন কোরো না—আমাকে খুন কোরো না!"

আলোকনাথ তার মাথা ধ'রে এক নাড়া দিয়ে কর্কশ স্বরে বল্‌লে, "যদি বাঁচ্‌তে চাস্‌, তবে সত্যি কথা বল্‌! নইলে আর এক আছাড়েই তোর সব লীলাখেলা সাঙ্গ ক'রে দেব!"

যুগলকিশোর হাঁপাতে হাঁপাতে তার কুৎসিত জীবনের সেই অপবিত্র অধ্যায়টার পুনরাবৃত্তি ক'রে গেল—প্রাণের ভয়ে একবর্ণও রেখে-ঢেকে বল্‌লে না। তারপর হাত জোড় ক'রে করুণ স্বরে বল্‌লে, "এইবার আমাকে ছেড়ে দাও বাবা! আমি কালই এ-পাড়া থেকে বাসা তুলে নিয়ে যাব!"

আলোকনাথ বল্‌লে, "তোকে খুন কর্‌লেও পাপ হয় না। কিন্তু এ-যাত্রা তোকে ছেড়ে দিলুম,—যা, বেরো এখান থেকে!" তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই—বাঘের মুখ থেকে হরিণ যেমন ক'রে পালায় তেম্‌নি তীরবেগেই—যুগলকিশোর আলোকনাথের সুমুখ থেকে উঠ্‌তে-পড়্‌তে ছুটে পালিয়ে গেল!

রামপ্রাণের মুখপানে চেয়ে আলোকনাথ বল্‌লে, "কেমন মশাই, এখন আপনার বিশ্বাস হোলো তো?"

রামপ্রাণ সবেগে মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "না!"

—"কেন?"

—"যুগলকিশোর দোষী—মহাপাপী। নিজের সব-চেয়ে বড় পাপের কথা সে যে গোপন ক'রে রাখে-নি, এ কখনোই হ'তে পারে না। বারবনিতার আশ্রয়ে, কুসংসর্গে যে কুলবধূ রাত্রিযাপন করেচে, তার সতীত্ব যে নষ্ট হয়নি, এ-কথা আমি বিশ্বাস কর্‌লেও আর কেউ কর্‌বে না। যার জন্যে আজ আমার ছেলে ঘর ছাড়া, তাকে আমি গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ব না! আমি সমাজের দাস, কুলত্যাগিনীকে নিয়ে শেষটা কি আত্মীয়-স্বজনের কাছে একঘরে হয়ে থাক্‌ব?"

এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম, সমস্তই ব্যর্থ! দুঃখে, রাগে, নিরাশায় নিস্তব্ধ হয়ে আলোকনাথ ছবিতে-আঁকা মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল!

এমন সময়ে ঘরের বাইরে শোনা গেল, গর্জ্জন ক'রে কে বল্‌ছে, "যা—দূর হ', বেরো, বেরো, বেরো এখান থেকে! কুলে কালি দিয়ে কোন্ মুখে তুই ফের এখানে ঢুক্‌তে সাহস কর্‌লি!"

"ঠাকুর-পো, ঠাকুর-পো, তুমি আমার গায়ে হাত তুল্‌লে—তুমি?"—এ মুকুলমালার গলা!

—"হ্যাঁ, আমি তোর গায়ে হাত তুলেচি, বেশ করেচি! এখানে

দাঁড়িয়ে থাক্‌লে আবার মার খাবি! ভালো চাস্ তো শীগ্‌গির বিদায় হয়ে যা!"

মুকুল বল্‌লে, "তোমার দাদা থাক্‌লে নিশ্চয়ই আজ তোমার এত সাহস হোতো না!"

—"দাদা থাক্‌লে আজ তুই খুন হতিস্!"

মুকুলমালা বল্‌লে, "মিথ্যে কথা! তিনি উকীল নন্!"

—"কী, আবার গালাগালি? তবে রে—" সঙ্গে সঙ্গে মুকুলমালার আর্ত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল!

আলোকনাথ আর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না, বিষম উত্তেজনায় তার বুকখানা ফুলে উঠ্‌ল, দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হোলো, সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্ কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল,—"কী! নারীর গায়ে হাত তোলা!" এই ব'লে ভয়ানক এক গর্জ্জন ক'রে লাফ মেরে সে ঘরের ভিতর থেকে বাইরে গিয়ে পড়্‌ল!......দেখ্‌লে, উঠানের উপরে দুইহাতে মুখ চেপে বসে পড়েছে মুকুলমালা, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক!

আলোকনাথের ভীষণ হুম্‌কী শুনেই সে চম্‌কে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল! এখন সাম্‌নেই তার সেই ক্রোধস্ফীত, দীর্ঘ-প্রস্থে বিপুল দেহ দেখে অবাক হয়ে তার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল।

আলোকনাথ চেঁচিয়ে বল্‌লে, "বাঙালী-বীর! এদিকে এগিয়ে এস,—পুরুষ যে নারীর ওপরে বীরত্ব প্রকাশ কর্‌বে কোন আইনেই তা বলে না। এদিকে এস, পুরুষের সঙ্গে লড়ো!" এ ব'লেই সে ঘুসি তুল্‌লে!

চকিতে মুকুলমালা তাদের মাঝখানে উঠে দাঁড়াল। তার মুখের ঘোম্‌টা খ'সে গেছে, কিন্তু এখন আর তার কোন লজ্জাই নেই! হাত

তুলে সে বল্‌লে, "থাক্! এই পশুকে মেরে আপনি আমার মান বাঁচাতে পার্‌বেন না—মিছে কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে কাজ নেই!"

বৃদ্ধ রামপ্রাণও সেখানে ছুটে এলেন। একটু আগেই তিনি আলোকনাথের বল-বিক্রম স্বচক্ষে দেখেছিলেন! পাছে পুত্রহত্যা হয়, সেই ভয়ে পাগলের মত আলোকনাথের হাত চেপে ধ'রে বল্‌লেন, "মশাই, ক্ষমা করুন—ওকে ক্ষমা করুন! বৌমার গায়ে হাত-তোলা ওর অন্যায় হয়েচে, আমি স্বীকার কর্‌চি!"

এক ঝট্‌কান মেরে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আলোকনাথ তাচ্ছীল্যের স্বরে বল্‌লে, "যাও বৃদ্ধ, যাও! তোমার স্বীকারে কি এসে যায়—কে তোমার কথা শোনে? এই কাপুরুষ যে আজ প্রাণে বেঁচে গেল, এ তোমার অনুরোধে নয়, তা স্পষ্ট জেনো।"—তারপর মুকুলমালার দিকে ফিরে কণ্ঠস্বরকে যথাসাধ্য শান্ত ক'রে বল্‌লে, "বোন, আর এখানে একদণ্ড নয়। আমি প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লুম, কিন্তু এই সামাজিক জীবগুলির পাথরের প্রাণ কিছুতেই গল্‌বে না—হাজার অনুরোধেও নয়, মনুষ্যত্বের মুখ চেয়েও নয়! তোমার শ্বশুরের একমাত্র ইচ্ছা, ঘর ছেড়ে তুমি পথে বেরিয়ে যাও! তাতেই তাঁর হেঁট মাথা নাকি আবার উঁচু হয়ে উঠ্‌বে! কিন্তু তুমি ভেবোনা বোন, যখন প্রতিজ্ঞা করেচি, তখন তোমাকে রক্ষা কর্‌ব আমিই! ভাইয়ের কাছে কোন সঙ্কোচ কোরো না—এস আমার সঙ্গে!"—এই ব'লেই মুকুলমালার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গিয়ে তাকে সে গাড়ীতে তুলে দিলে—তার সম্মতির কোন অপেক্ষা না রেখেই!

রামপ্রাণ আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "যাক্—আপদ বিদেয় হোলো! দুর্গা-শ্রীহরি!"

নিস্ফল আক্রোশে ফুল্‌তে ফুল্‌তে উকীল-পুত্র বল্‌লেন, "বাবা, ও বেটার নামে 'ট্রেস-পাসে'র 'চার্য' দিয়ে আমি কালই নালিশ কর্‌ব!"

মুখ খিঁচিয়ে রামপ্রাণ বল্লেন, "এই কেলেঙ্কারি নিয়ে আর আদালতে যায় না! ঢের হয়েচে, বোকারাম কোথাকার!"

* * * *

আলোকনাথের সঙ্গে মুকুলমালা আবার যখন ফিরে এল, তখন রাধারাণী দুঃখের ম্লান হাসি হেসে বল্লে, "আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলুম বোন! সমাজকে আমি খুব চিনেচি। তুমি যে আবার এখনি ফিরে আস্‌বে, এ আমি আগেই জান্‌তুম। এই দেখ, তোমারি চক্ষের জলে সারারাত ধ'রে ভিজ্‌বে ব'লে, তোমার জন্যেও আমি আলাদা বিছানা পেতে রেখেচি!"

রাধারাণীর কাঁধে মাথা রেখে, অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে মুকুলমালা বল্লে, "আমি কখনোই ফিরে আস্‌তুম না, কখনোই ফিরে আস্‌তুম না। ভগবান, কেন তাঁকে দেশত্যাগী করালে? নইলে আজ আমাকে তাড়িয়ে দেয়, কার এত সাধ্য!"

সাত

পুকুরের ঘাটের উপরে রাধারাণী একলাটি বসে ছিল।

ভরা-বাদলে মেঘের দৌরাত্ম্যে শুক্লপক্ষের অনেকগুলো রাত্রি বাজে-খরচ হয়,—জ্যোৎস্না ফোটেনা, চাঁদ জাগেনা, আকাশের রূপ দেখা যায় না; —পৃথিবী তখন সুধু ছায়াময়ী শব্দময়ী—বাইরে তখন খালি অনবরত বর্ষার একঘেয়ে জলতরঙ্গ ঝুম্-ঝুম্ ঝুম্-ঝুম্ বাজ্‌তে থাকে এবং তা-শুনে মনের খেদে দখিন হাওয়ার গান থেমে যায়,কোকিল-পাপিয়া নীরব হয়ে পড়ে।

কিন্তু এরই মধ্যে মাঝে মাঝে এমন এক-একটা দিন আসে, যখন চার-পাঁচদিন বৃষ্টি বাদলের পরে বিরক্ত আকাশ তার মুখের ঘোম্‌টা টান্ মেরে খুলে ফেলে দেয়, যখন মেঘ্‌লা ঘুম থেকে জেগে উঠে পূর্ব্বের উদয়-তোরণে চাঁদ এসে বিচিত্র বিস্ময়ে পৃথিবীর পানে চেয়ে দেখে, যখন চপল মেয়ে জ্যোৎস্না খেলার ছুটি পেয়ে পরম কৌতুকে দুনিয়াময় গা এলিয়ে বেড়ায়, যখন কোকিল-পাপিয়ার উচ্ছ্বসিত গীতোৎসবের আসরে দখিন হাওয়া নতুন ফুল-ফোটার কাহিনী প্রচার ক'রে যায়! বর্ষার এই জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রিগুলি দুর্লভ বটে, কিন্তু কি মধুর, কি অপূর্ব্ব!

সেদিনের রাতও ঠিক তেম্‌নি চমৎকার ছিল। আকাশে চাঁদের মুখে মেঘের ছায়া নেই, পৃথিবীতে জ্যোৎস্নার লীলাক্ষেত্রে অন্ধকারের কালিমা নেই। পুকুরের বুক জুড়ে ছোট ঢেউগুলি ক্রমাগত ব্যস্ত হয়ে আনাগোনা কর্‌ছে—তাদের গতির ছন্দে ছন্দে ফুটে উঠ্‌ছে হীরা-মাণিকের অশ্রান্ত আভাস!

রাধারাণী চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু তার দৃষ্টি যেন আকাশ পেরিয়ে আরো দূরে—অনেক দূরে, অতীতের ভিতরে গিয়ে

একেবারে দিশেহারা হ'য়ে গেছে! জীবনের অতীত পৃষ্ঠাগুলি খুলে খুলে সে নিজের বর্ত্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখ্‌ছিল আর ভাব্‌ছিল।.........

সেই দিন! যেদিন খেলাঘরের পুতুলের বিয়ে দেবার সাধ না মিট্‌তেই তার জীবনে বিয়ের শাঁখ আচম্বিতে বেজে উঠ্‌ল এবং বাসরের ফুলের গন্ধ মিলিয়ে না যেতে-যেতেই ওলাউঠার কবলে প'ড়ে, তার স্বামী ইহলোক থেকে শেষ-ছুটি নিয়ে চ'লে গেলেন। রাধারাণী একবার স্বামীর মুখ ভেবে দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু সে মুখ কিছুতেই আর মনে পড়্‌ল না—সে হারা মুখের স্মৃতিটুকুও আর তার সম্বলে নেই!

স্বামী বিনা নারীর জীবন বিফল হয়, আশার ফুল শুকিয়ে যায়, আনন্দ নিরুদ্দেশ হয়ে পালায়, কিন্তু বিদ্রোহী যৌবন তবু সমাজের কোন মানাই মানে না, নারীর সেই বিফল দেহে তবু সে আসে, আসে, আসে,—ধীরে, ধীরে, ক্রমে, ক্রমে—নির্ম্মমের মত, নিষ্ঠুর পরিহাসের মত! যৌবন আসে, আর তার সঙ্গে আসে আবেগ আর উচ্ছ্বাস আর বাসনা! শত ব্যর্থতা আর হতাশার মাঝখানেও অভাগী নারীকে তখন তারা সবাই মিলে চপল ক'রে তোলে। কিন্তু যৌবনের সে রস-তরঙ্গের আঘাতেও রাধারাণী নুয়ে পড়েনি, মনের জোরে নিজেকে তখনো অনায়াসে আগ্‌লে রাখ্‌তে পেরেছিল।

অল্প বয়স থেকেই লেখাপড়ার দিকে তার মনে একটা স্বাভাবিক টান্ ছিল। বয়সের সঙ্গে সেই ঝোঁক্ তার এতদূর বেড়ে উঠেছিল যে, গাঁয়ের লাইব্রেরীর সমস্ত বইই সে একাধিকবার না প'ড়ে ছাড়েনি। তাছাড়া কিনে এনেও বড় কম বই পড়েনি। তার মত পাঠিকা বাঙ্‌লা দেশে বেশী থাক্‌লে, বাঙালী লেখকদের ঘরে আজ অনাবৃত অতিথির মতন দারিদ্র্য এসে মাথা গলাতে পার্‌ত না। গেরস্থালীর কাজ-কর্ম্মের পর সে

যে অবসরটুকু পেত, এই পড়াশুনোর বাতিকেই তা অনায়াসে কেটে যেত পাড়ার মেয়ে-সভায়, তাসের আসরে বা পুকুর-ঘাটের জটলায় তার দেখা কেউ পেতনা—পরচর্চ্চার চেয়ে পাঠ-চর্চ্চার নিভৃত আনন্দের জন্যেই সে ছিল বেশী লালায়িত।

পাড়ার মেয়েরাই যে-মেয়ের দেখা পেত খুব কম, পল্লী-পুরুষদের সলোভ দৃষ্টি আকর্ষণ করবার সুযোগ যে তার খুবই কম ঘট্‌ত, এ কথা বলাই বাহুল্য। 'সলোভ দৃষ্টি' বল্‌লুম এই জন্যে যে, রাধারাণীর রূপ ছিল দ্রষ্টব্য জিনিস। কবি ও শিল্পীর আকাশচারিণী পরিকল্পনাও সৌন্দর্য্যের এই বাস্তব আদর্শের কাছে খাটো হয়ে পড়্‌তে পারে। কাব্যে, পটে বা পাথরে রাধারাণীর দেহকে হুবহু ফোটাতে পারলে যে-কোন কলাবিদের প্রাণ আনন্দের সপ্তম স্বর্গে বিচরণ করবে। উর্ব্বশী বা মেনকাকে দেখ্‌তে কেমন তা জানিনা;—কিন্তু রাধারাণী সে যুগে জন্মালে আজ আমরা সেকালের পুরাণে দেখ্‌তে পেতুম, তার জন্যে আরো কত মুনি-ঋষির চির-জীবনের তপস্যা চিত্ত-বিভ্রমে ব্যর্থ হয়ে গেছে!

তবে একালে মুনি-ঋষির ধ্যানভঙ্গের সুযোগ না ঘটলেও তার অজানিত ভক্তের অভাব হয়-নি মোটেই। রূপের খ্যাতি সংক্রামক রোগের মত আশ্চর্য্য তাড়াতাড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং রূপব্যাধির প্রকোপে কত লোকই যে মরেছে আর মরছে কিংবা আধ-মরা হয়েছে বা হচ্ছে, রূপসীরা তার সঠিক হিসাব রাখ্‌লে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন! "রমণী সর্ব্বনাশিনী" এমন উক্তি যাদের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, তারা নারী-বিদ্বেষী ততটা নয়—যতটা রূপব্যাধিগ্রস্ত! রূপের মড়কে তারা মজেছে বা মরমে মরেছে, বিষাক্ত নয়ন-বাণ তাদের হাড়ে হাড়ে বিঁধে আছে, তাইতো এমন উক্তি বেরিয়েছে তাদের কাতর মুখ থেকে!

অতএব রাধারাণী নিজে না জানলেও, তার আঁচল খানা-তল্লাসি

কর্‌লে যে কত হারা প্রাণের খোঁজ পাওয়া যেত, তার হিসাব রাখা শক্ত ব্যাপার। যদি কেউ বলেন, "বাইরে যার দেখা পাওয়াই দুর্লভ, তার দ্বারা এতগুলো হৃদয়-হরণ কি-ক'রে সম্ভব হোলো, তবে এর সোজা জবাব হচ্ছে এই যে, গভীর কাননের আনাচে কানাচে, চোখের আড়ালে, নিবিড় আঁধারে বনফুল ফুট্‌লেও, মধু-পিয়াসী সুরসিক ভ্রমর-মৌমাছির কখনো অভাব হয় না। যেখানেই হোক্, ফুল যদি ফোটে খোঁজ তারা পাবেই !........."

রাধারাণীর রূপ খালি অন্যকে মার্‌লে না, সে নিজেও মোলো নিজের রূপের আগুনেই। অথচ এ ব্যাপারে তার কোনই হাত ছিল না। যেদিন তার অদৃষ্ট-চক্র হঠাৎ বিপরীত দিকে ফিরে গেল, সে দিন তার জীবনের কি ভয়ানক দিন! সেই দিনের কথা স্মরণ হ'লেই ভগবানের অস্তিত্বে তার সন্দেহ জন্মাত। সে বিপুল আবেগে ব'লে উঠ্‌ত—নেই, নেই, ভগবান নেই! ভগবান থাক্‌লে আমার নির্দ্দোষ জীবনে এমন দুর্ভাগ্যের দিন আস্‌ত না, কখনোই আস্‌তো না!

.........একদিন হঠাৎ তাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়্‌ল! ডাকাতরা টাকাকড়ির কোনই খোঁজ কর্‌লে না—তারা খালি রাধারাণীকে নিয়ে রাত্রের অন্ধকারের কোথায় স'রে পড়্‌ল।.........পরদিন সকালে কতক গুলো চাষা একটা পাটক্ষেতের পাশে রাধারাণীর অজ্ঞান দেহ আবিষ্কার কর্‌লে।

তারপর?—যা বরাবরই ঘটে আস্‌ছে!—গ্রামবৃদ্ধদের আসরে প্রবল আন্দোলন, শাস্ত্র-বিধানের পুনরাবৃত্তি, মেয়ে-মহলে অবিরাম ঘোঁট্, এবং পিতৃগৃহ থেকে রাধারাণীর নির্ব্বাসন! এ নইলে হিন্দু-সমাজের বিশেষত্ব আর পবিত্রতা বজায় থাকা নাকি অসম্ভব!

কল্‌কাতায় রাধারাণীদের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় থাক্‌তেন। এই

ঘটনার খবর পেয়েই তিনি তাড়াতাড়ি গ্রামে এসে হাজির হলেন রাধারাণীর অসহায় অবস্থা দেখে তাঁর সদয় প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগ্‌ল-এমন কি অসহ দুঃখে তিনি না কেঁদে থাকতে পারলেন না। তারপ চোখ মুছে তিনি রাধারাণীর বাপকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন তুমি মেয়ে ব্যবস্থা কি করচ ?"

—"কি আর করব—এক ব্যবস্থা আছে। এ মেয়ে ঘরে থাক্‌লে জা মান সব যাবে, সমাজে একঘরে হব। মেয়েকে ত্যাগ করা ছাড়া আ তো কোন উপায় দেখ্‌চি না !"

—"কিন্তু তুমি ত্যাগ করলে রাধারাণী কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ?"

—"পথে। নিয়তির লিখন খণ্ডাবে কে ? এতে আমার কোন হা নেই। প্রাণ কাতর হ'লে মনে করব, আমার রাধারাণী ম'রে গেছে !"

—"তাও কি হয় ! সমাজের ভয়ে তুমি যদি রাধারাণীকে ত্যাগ কর তবে ও-অভাগীকে আমার হাতে দাও। আমার নিজের মেয়ের মতই আমার বাড়ীতে থাকবে। এখানে কি ঘটেচে না ঘটেচে, কলকাতার কে তা জানে না। জান্‌লেও ক্ষতি নেই, কল্‌কাতা সমাজহীনের মুল্লুক সেখানে কেউ কারুকে একঘরে করতে পারে না।"

সঙ্গত কথা ! রাধারাণীর বাপ অত্যন্ত আগ্রহে সম্মতি দিলেন আত্মীয়টি রাধারাণীকে সঙ্গে নিয়ে কল্‌কাতায় চলে গেলেন।

কিন্তু তিনি কল্‌কাতায় নিজের বাড়ী ব'লে যে বাড়ীতে গিয়ে রাধা রাণীকে নিয়ে ঢুকলেন—সেখানে 'সতীত্ব' অতি অশ্রাব্য কথা ! রাধা রাণী সহরের এ পল্লী চিন্‌ত না—প্রথমে কোনই সন্দেহ করেনি। বিশেষ এই আশ্রয়দাতা দয়ালু আত্মীয়টি যখন প্রায় তার বাপের বয়সী, তখ সন্দেহের কোন কারণই ছিল না—বরং তাঁর সদয় ব্যবহারে তার অসহায় প্রাণ শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল !

কিন্তু তাঁর দয়ার মর্ম্ম বুঝ্‌তে একরাত্রি সময়েরও দরকার হোলো না!···ওঃ, কী কঠোর সে জাগরণ! আলোকনাথকে সে কি অকারণে বলেছিল যে, "পুরুষকে আমি বিশ্বাস করি না?"

এই তার ক্ষুদ্র জীবনের অশ্রুসিক্ত ইতিহাস! তার জীবনের সঠিক ও সম্পূর্ণ ইতিহাস আর কেউ জানে না—এমন-কি, তার বাপ-মাও না। কারণ, কল্‌কাতায় পৌছেই সেই পরম দয়ালু আত্মীয়টি রাধারাণীর বাপকে তারের খবর পাঠিয়েছিলেন যে, "তোমার মেয়ে পথেই আমার চোখে ধূলো দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে!" এমন পাপিষ্ঠার জন্ম দিয়েছেন ব'লে রাধারাণীর বাপও বোধ করি যার-পর-নাই অনুতপ্ত হয়ে উঠেছিলেন!

***

অতীতের যে বেদনার কাহিনী রাধারাণীর মর্ম্ম-কুহরে অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে ছিল, আজ্‌কের এই বিশ্বব্যাপী চাঁদের আলো যেন সেখানেও ঢুকে সমস্ত গোপনতাকে অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। অতীত থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত এই তো দুঃখ-শোকের একটানা রেখা, মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই একবিন্দু; কিন্তু এর পরেও আবার সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ আছে, ললাট-লেখক বিধাতার নির্দ্দয় হস্ত এ রেখাকে সেই ভবিষ্যতের ভিতরে আরো কতদূর টেনে নিয়ে যাবে—আরো কতদূর গো, কতদূর? এ রেখার কি সীমা নেই?

প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া গেল না। বিধাতা কারুকে কোনদিন জবাব দেননি। জন্মদুঃখীর অনন্ত প্রশ্ন চিরদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ক'রে চিরন্তন হাহাকারে ফেটে মরেছে;—কিন্তু বৃথা, বৃথা, বৃথা। বিধাতা কোনদিন জবাব দেন নি। তবু পৃথিবীতে ভগবানের অস্তিত্বে মানুষের বিশ্বাস আছে শুনি। হয়তো এ বিশ্বাসকে সত্যসত্যই

সে বিশ্বাস করে না ; হয়তো এটা এখন আর বিশ্বাস নয়—অন্ধ-সংস্কার মাত্র ! হ'তে পারে। কারণ, বিধাতা কোনদিন জবাব দেননি।······

পিছন থেকে আলোকনাথ ডাক্‌লে, "রাধারাণী !"

সুপ্তোত্থিতের মত রাধারাণী চম্‌কে উঠ্‌ল। ফিরে ব'সে বল্‌লে, "আসুন।"

আলোকনাথ ঘাটের উপরে ব'সে প'ড়ে বল্‌লে, "তোমাকেই খুঁজ্‌ছিলুম। এখানে এমন একলাটি ব'সে আছ কেন ?"

—"সারাদিন মুকুলমালার কান্না শুনে শুনে আমারও মনটা ভারি স্যাঁৎসেতে হয়ে পড়েছিল। আর পারলুম না। বাইরে বেরিয়ে এলুম, একটু হাঁপ্ ছাড়্‌তে। কিন্তু বাইরের দুঃখ এড়াতে গিয়ে এখন নিজের দুঃখ নিয়েই মাথা খুঁড়ে মর্‌চি। এত যে ভাবি, দূর হোক্-গে, ভেবে আর লাভ কি, যা হবার তা হবে ! পোড়া মন তবু মানে না, ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সে করবেই !"

—"ভাবনার আর দোষ কি, তোমার মত অবস্থায় পড়লেও লোকে যদি না ভাবে, তবে ভাব্‌নার সৃষ্টি হয়েছে কি জন্যে ?"

—"আমার মত অবস্থা ! আমার যে কি অবস্থা, আপনি তার কতটুকু জানেন ? কিছুই না !"

—"তোমার অবস্থা তো স্বচক্ষেই কতক দেখ্‌চি। যা দেখিনি, তারও কিছু কিছু শুনেচি।"

সচকিতে রাধারাণী বল্‌লে, "শুনেচেন ! কার কাছে ?"

—"মুকুলমালার মুখে। আগাগোড়া গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌লে না,—এখনো সে লজ্জায় ভালো ক'রে আমার সঙ্গে কথা কয় না—তবে আমার বিশেষ অনুরোধে কতক্ কতক্ আভাস দিলে। সেই আভাসই যথেষ্ট।"

—"আমার কথা জান্‌বার জন্যে আপনার এত আগ্রহ কেন ?"

—"দেখ্‌চি, তোমার কিছু সাহায্য করতে পারি কিনা!"

"অসম্ভব। পারবেন না।"

—"পারলেও পারি! আমি কখনো আশা ছাড়তে রাজি নই।" একটু থেমে আলোকনাথ পুকুরের জলে জ্যোৎস্নার পুলকাকুল দোললীলার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বল্‌লে, "রাধারাণী, এখন যা বলতে এসেচি শোনো। মুকুলমালার বাপের সঙ্গে আজ দেখা করেচি।"

কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে রাধারাণী শুষ্ক স্বরে বল্‌লে "তারপর?"

—"তারপর আর কি,—তোমার কথাই সত্যি। মুকুলমালার বাপ আমার সকল কথা শুনেও বল্‌লেন, 'বারবনিতার ঘরে যে রাত কাটিয়েচে, সে মেয়েকে বাড়ীতে এনে আমি বিপদে পড়তে রাজি নই।' আমি তাঁকে অনেক কাকুতি-মিনতি করলুম, কিন্তু কোনই ফল হোলো না।"

রাধারাণী বল্‌লে, "সে তো আমি আগে থেকেই জানতুম। তাই একেবারে মুকুলমালাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে না গিয়ে আপনাকেই আগে যেতে বলেছিলুম। এখন যান, মুকুলমালাকে সব কথা জানিয়ে আসুন।"

—"রাধারাণী, এ খবর মুকুলমালাকে দিতে আমার বুক ফেটে যাবে। আমি তা পারব না। পারো তো, তুমিই দিও।"

—"তা যেন দিলুম। কিন্তু এখন আমাদের দুজনকে নিয়ে আপনি কি করতে চান?"

—"একটা কিছু করবই। দুদিন ভাবতে সময় দাও।"

—"ভাবতে হয় মুকুলমালার জন্যে ভাবুন, কিন্তু আমি আর আপনার ঘাড়ের ওপরে বোঝার মত থাকতে চাই না। আমাকে নামিয়ে ফেলুন, আমিও বিদায় হই।"

—"মুকুলমালাকেও ছাড়্‌ব না, তোমাকেও না। আমাকে তোমরা

কেন এতটা অমানুষ ব'লে ধ'রে নিচ্ছ? আমার কি কর্ত্তব্য-বোধ নেই? আমি কি পাথরের মত অসাড়, জড়পদার্থ? কোন্ প্রাণে আমি এমন অসহায়-ভাবে তোমাদের দুজনকে সংসারের পাঁকের সমুদ্রে অকূলে ভাসিয়ে দেব? না, না, না,—সে হবে না, হ'তে পারে না। যদি অন্য কোন উপায় কর্‌তে না পারি, তবে তোমরা আমারই বাড়ীতে থাক্‌বে। এখানে তোমরা সুখী না হ'তে পারো, কিন্তু অপবিত্র যে হবে না, এটা একেবারে নিশ্চিন্ত। সেইটুকুই আমার সান্ত্বনা।"

কিছুক্ষণ রাধারাণী কোন কথাই কইল না, মাটির দিকে চেয়ে ব'সে রইল। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বল্‌লে, "আলোকবাবু, কবিরা উপমা দিয়েচেন, শুক্‌নো মরুভূমিতেও শ্যামলতার লীলাকুঞ্জ থাকে। পুরুষজাতির ভিতরে আপনাকে দেখে আমার সেই উপমা মনে পড়্‌চে। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাদের গ্রহণ করলে সমাজ আপনাকে ত্যাগ কর্‌বে।"

একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে আলোকনাথ বল্‌লে, "সমাজ! অমানুষের সমাজকে আমি থোড়াই কেয়ার করি! সমাজ আমার কি কর্‌বে, কি কর্‌তে পারে? আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেচি, সমাজ সৃষ্টি হয়েচে দরিদ্রের মাথায় দণ্ডাঘাত আর ধনীর পদসেবা কর্‌বার জন্যে। সমাজ আমার কাছে মাথা নত ক'রে থাক্‌বে,—আর নাই-ই যদি থাকে, বড় বয়েই গেল! তার রাগে বা খোসামোদে আমি তোমাদের ত্যাগ কর্‌ব না—এইটিই আমার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা।"

রাধারাণী ব্যথিত কণ্ঠে বল্‌লে, "আপনি যে আমাদের রক্ষা কর্‌বেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু এই ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে যে, আপনার মত পুরুষ-সিংহ এদেশে আরো জন্মাননি কেন? আমাদের দুজনকে দুঃখে আপনি এতটা বিচলিত হয়ে পড়েচেন, কিন্তু জানেন কি আলোকবাবু, এই বাঙ্‌লা দেশে, এখন আমাদেরি মত—এমনকি

আমাদের চেয়েও ঢের-বেশী দুঃখিনী, ঢের-বেশী হতভাগিনী কত শত নারীর অবিরাম দীর্ঘশ্বাসে সারা আকাশ তপ্ত হয়ে উঠ্‌চে?"

আলোকনাথ চিন্তিত মুখে বল্‌লে, "এতদিন সে কথা ভেবে দেখিনি, ভাব্‌বার কোন কারণও পাইনি। কিন্তু আজ তোমাদের দেখে তাদের দুঃখ আমি মনের মাঝখানে অনুভব কর্‌চি।"

রাধারাণী আপন মনেই তিক্ত, তপ্তস্বরে ব'লে যেতে লাগ্‌ল, "তারা নারী, পুরুষের মায়ের জাতি, বোনের জাতি, ভার্য্যার জাতি! তাদের জঠরে পুরুষের জন্ম, তাদের স্তন্যে পুরুষ বাল্যে বেঁচে থাকে, তাদের স্নেহে-ভালবাসায়, যত্নে-আদরে, সেবায়-প্রেমে পুরুষের জীবন-দীপের শিখা দারুণ ঝড়-ঝাপ্টাতেও নিষ্কম্প নিরাপদ হয়ে জ্বল্‌তে থাকে! কিন্তু অসময়ে পুরুষ তাদের এম্‌নি ক'রেই নির্ব্বাসন দণ্ড দেয়, তাদের অপরাধ,—ছলে-বলে-কৌশলে ঐ পুরুষই নিজেদের প্রবৃত্তির আগুনে তাদের ধ'রে নিক্ষেপ করেচে! যে পুরুষ বিচারক, সেই পুরুষই আসামী!"

আলোকনাথ বল্‌লে, "সত্য! জগতে এ দারুণ প্রহসনের অভিনয় আরো কত দিন চল্‌বে!"

রাধারাণী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আবেগ ভরে ব'লে চল্‌ল, "কিন্তু এ অভিনয় আরো ভয়ানক হয়ে উঠেচে এই বাঙ্‌লা দেশেই! এদেশে নারী একেবারে বন্দিনী—সূর্য্যালোকে ঘোম্‌টা খোলাও তার পক্ষে মস্ত-একটা অপরাধ! পাছে তার চোখ-কান ফোটে, পাছে তার স্বাধীন ইচ্ছা জাগে, পুরুষের কপটতা তার কাছে ধরা প'ড়ে যায়, সেই ভয়ে সমাজ তাকে শিক্ষার সুযোগ পর্য্যন্ত দেয় না—সে একেবারে অজ্ঞান, অবোধ, দুর্ব্বল একটা জ্যান্ত জড়পদার্থের মত অন্তঃপুরের অন্ধকার কয়েদখানায় বন্দী হয়ে থাকে—পৃথিবীর বাইরের আলোতে গিয়ে দাঁড়ালে, পুরুষের সাহায্য ভিন্ন এক-পাও সে চল্‌তে পারে না! যে পাপিষ্ঠারা কু-বাসনার তাড়নায় পুরুষের

আলিঙ্গনে আত্মদান করে, তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হোক্—আমি তাদের কথা বল্‌চি না। কিন্তু যে অভাগীরা বিনা দোষে দোষী, পুরুষের আক্রমণেই যারা পড়েচে, মনে যারা সীতাসাবিত্রীর চেয়েও কম সতী নয়, সমাজ তো তাদেরও ক্ষমা করে না! যে সমাজের বিধানে তারা বাইরের বিশ্বে কালা আর বোবা আর পঙ্গু, বিদেশীর মতই অসহায়, সেই সমাজই আবার তাদের ঐ অচেনা-অজানা বাইরের পৃথিবীরই দুর্গম পথের ধূলো-কাঁকরের ওপর ঠেলে ফেলে দেয়—তারা আসলে নিরপরাধ জেনেও! তখন আর তাদের উপায় কি? কেউ না খেয়ে মরে, যার অতটা সাহস নেই—সেও অন্যরকমে দিনে দিনে তিলে-তিলে পাঁকের ভিতরে ডুবে মর্‌তে বাধ্য হয়। এর জন্যেও সমাজই দোষী, কারণ সতীকে সে জোর ক'রে অসতী করে!"

আলোক বল্‌লে, "রাধারাণী, তোমার সঙ্গে আমার মতের পুরো মিল আছে। আমি জানি, শাস্ত্র-রচনা আর সমাজ-গঠনে নারীর স্বাধীন কোন ইচ্ছা বা শক্তি ছিল না,—তাই তাকে এমন কোণঠাসা হয়ে থাক্‌তে হয়েচে। আদর্শ সমাজ গড়্‌তে হ'লে নর-নারী কারুকেই প্রধান হ'তে দিতে নেই, তারা যাতে সমাজের যমজ সন্তানের মত থাক্‌তে পারে, সেই চেষ্টাই কর্‌তে হয়! সমন্বয় না থাক্‌লেই যে বিপদ ঘটে, ইতিহাসে সে দৃষ্টান্ত আছে। প্রাচীন মিশরে প্রধান ছিল মেয়েরা, তার ফলে সংসারে পুরুষদের থাক্‌তে হোতো প্রায় বাইরের অতিথির মতন, উত্তরাধিকার-সূত্র চল্‌ত মায়েদের জের দিয়ে, এমন কি স্বামীরা টাকা ধার নিলে মিশরের নারীরা ঠিক কাবুলিওয়ালার মতই সুদের জন্যে অত্যাচার কর্‌তেন!"

রাধারাণী বল্‌লে, "কিন্তু সে অত্যাচারও নিশ্চয় এদেশের পুরুষদের চেয়ে ভয়ানক ছিল না।"

—"কোন্‌টা বেশী ভয়ানক, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নেই।

আমি বল্‌তে চাই, হাতে অতিরিক্ত শক্তি পেলে তা দিয়ে নিজের স্বার্থ যে-কোনরকমে রক্ষা করা মানুষের চিরকেলে স্বভাব। এমন স্বেচ্ছাচারিতা আমাদের নারীরা যে চিরকাল ধ'রে মুখ বুঁজে সহ্য ক'রে আস্‌চেন, এ নিশ্চেষ্টতাকেও আমি প্রশংসা কর়তে পারি না।"

—"তা ছাড়া আর উপায় কি! আমরা যে সহ্য কর়তে, নিশ্চেষ্ট হ'তে বাধ্য!"

—"তাহ'লে বাঙ্‌লার নারীরা কখনো স্বাধীনতাও পাবে না। দেখ রাধারাণী, পৃথিবীর কোন দেশেই পুরুষ যেচে নারীকে স্বাধীন ক'রে দেয়নি। সেকালের রোমের ইতিহাসে পড়েচি, পুরুষরা দাবী গ্রাহ্য করেনি ব'লে নারীরা দলে দলে রাজসভায় এসে পুরুষদের আক্রমণ ক'রে-ছিল। পুরুষরা তখন দায়ে প'ড়ে নারীর প্রাপ্য ছেড়ে না দিয়ে পারেনি। একালেও য়ুরোপে দেখ, স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্যে, পুরুষের সমকক্ষ হবার জন্যে 'সাফ্রেজিষ্ট' নারীরা কত যুদ্ধ, কত ত্যাগস্বীকার, কত কষ্ট সহ্য কর়চেন। স্বাধীনতা কি অম্‌নি পাওয়া যায়? এজন্যে অধীনকে আগে বিদ্রোহী হ'তে হবে! সব দেশের মত এ দেশেও দু-চার জন উদারপ্রাণ পুরুষ আছেন বটে,—কিন্তু তাঁরা যে সিন্ধুর মাঝে বিন্দুর মত! কেবল তাঁদের মুখ চেয়ে ব'সে থাক্‌লে তো চল্‌বে না! তোমরাও বিদ্রোহী হও—নিজেদের চেতনার আর যোগ্যতার পরিচয় দাও, অত্যাচারের প্রতিবাদ কর! নইলে ভগবানও তোমাদের স্বাধীনতা দিতে পার়বেন না—দু-চারজন পুরুষের চেষ্টা তো কোন্ ছার!"

—"আলোকবাবু, আপনার যুক্তি আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু দেখ্‌চেন না কি, পাছে অন্তঃপুরে সেই চেষ্টা জাগে ব'লে পুরুষরা আগে থাক্‌তেই ঘাঁটি আগ্‌লে রয়েচে? সে কথাও তো আগেই বলেচি। আমাদের শিক্ষার সুযোগ কই?"

—"হ্যাঁ, তোমাদের অবস্থা গুরুতর বটে,—কিন্তু এ-রকম কারণ দেখালে তো চল্‌বে না। ইংরেজের হাজার হাজার কামান চারিদিকে পাহারা দিচ্ছে, আর আমাদের একটিও কামান নেই—এ তো একটা সহজ কারণ। শুধু সেই জন্যেই ত দেশ ইংরাজের গোলাম হ'য়ে নেই? দেশে এখন শিক্ষিত নারীরও তো অভাব নেই, তাঁরাই-বা কতটুকু বিদ্রোহ প্রকাশ করেছেন? আসল কথা কি জানো রাধারাণী? এসব তোমাদের অসাড় মনের দোষ—শিক্ষার দোষ নয়।"

রাধারাণী উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আমি এখন মুকুলের কাছে চল্‌লুম, সে বেচারী খবর পাবার আশায় পথ চেয়ে ব'সে আছে।"

আলোকনাথ বল্‌লে, "রাধারাণী, তাব'লে ভেবোনা যেন তোমার কথা আমার মনের ভেতরে ঢোকেনি। তুমি যে পতিতা-সমস্যার কথা বল্‌লে, আমি তা পূরণের চেষ্টা প্রাণপণেই কর্‌ব। আগে আরো খোঁজ-খবর নি,—তারপর এবিষয় নিয়ে আমার কর্ত্তব্য কি, তা ভেবে দেখ্‌ব। কিন্তু তার আগে তুমি পালাবার নাম মুখে এন না—এই আমার অনুরোধ।"

আট

মঞ্জরী বসে বসে একখানি ছবি আঁক্‌ছিল—প্রাকৃতিক দৃশ্য।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে দেখে তার মুখখানি মিষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে হাতের তুলিটি 'প্যালেটে'র উপরে রেখে দিয়ে বল্‌লে, "এই যে আলোকবাবু, আজ ক'দিন থেকে আপনি বড় আশ্চর্য্য-রকম অদৃশ্য হয়ে আছেন! আমি ভেবেছিলুম, সেদিন আমার সঙ্গে তর্ক ক'রে আপনি চটে গেছেন!"

আলোক একখানা সোফার উপরে বসে পড়ে বল্‌লে, "তর্ক ক'রে নারীর ওপরে চটে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

মঞ্জরী বল্‌লে, "নারীর সঙ্গে তর্কে হেরে গেলেও কি আপনি চটে যান না?"

আলোক বল্‌লে, "নিশ্চয়ই নয়! নারীর কাছে পুরুষ কখনো জেতে না, আর না-জেত্‌বার আসল কারণ হচ্ছে, তর্কে নারী কখনো হার-স্বীকার করে না।"

মঞ্জরী বল্‌লে, "আপনি কি তর্কে নারীকে এতই শক্তিমতী ব'লে বিবেচনা করেন?"

—"হুঁ, তা করি বৈ কি! পুরুষের সঙ্গে যুক্তিতে যখন আর এঁটে উঠ্‌তে পারো না, তখন তোমরা ভগবান-দত্ত ব্রহ্মাস্ত্রের আশ্রয় নাও! তোমাদের ঐ ডাগর নয়ন সজল-ছলছল আর ঐ গোলাপী অধর স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে, বেচারী পুরুষরা তখন হার না মেনে আর করে কি বল! একচোখো ভগবান যে তাদের নিরস্ত্র ক'রে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েচেন!"

মঞ্জরী বল্‌লে, "আমি আবার এর উল্টো দৃষ্টান্তও জানি। আমি

জানি, সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে তর্ক বাধ্‌লে, আপনার এই বেচারী পুরুষরা অনেক সময়ে কথায় না পেরে লাথি-চড়-ঘুসির দ্বারা স্ত্রীর মুখবন্ধ ক'রে দেন।"

ভুরু কুঁচ্‌কে আলোক বল্‌লে, "এমন পুরুষকে তুমি কখনো স্বচক্ষে দেখেচ, না লোকের মুখে শুনেই এ-কথা বল্‌চ ?"

মঞ্জরী বল্‌লে, "স্বচক্ষে দেখেচি—রোজ দেখ্‌চি। রাস্তার ওপরে, আমাদের ঠিক সাম্‌নের বাড়ীতেই এমন একজোড়া স্বামী-স্ত্রী বাস করেন। ঐ স্বামী-রত্নটির আচরণ দেখ্‌লে মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, উনি যদি মানুষী বউএর বদলে একটি জয়ঢাককে বিয়ে ক'রে ঘরে আন্‌তেন, তাহ'লে খুব ভালো হোতো।"

—"জয়ঢাক ?"

—"হ্যাঁ। ঐ স্বামীটি নিজের স্ত্রীকে জয়ঢাক ছাড়া আর কিছু ভাবেন ব'লেও তো মনে হয় না। উঠ্‌তে-বস্‌তে স্ত্রীকে পিট্‌চেন আর পিট্‌চেন আর পিট্‌চেন !"

—"এপাড়ায় আমার বাড়ী হ'লে তোমাদের ঐ পড়্‌সীটির ঢাক-বাজানো আমি একদিনেই বন্ধ ক'রে দিতুম। মঞ্জু, এরকম পুরুষ বোধ হয় দেশে বেশী নেই !"

—"কি ক'রে বল্‌ব ? স্বচক্ষে তো নিত্যই এ ব্যাপার দেখ্‌চি, আর স্বচক্ষে যাদের দেখ্‌চি না, তাদের ভেতরে এমন লোক কম আছে কি বেশী আছে, না জেনে তা কেমন ক'রে বল্‌ব ?"

আলোক গাঢ় স্বরে বল্‌লে, "মঞ্জু, অন্তত আমাকে এ দলের বাইরে ব'লে জেনো।"

মঞ্জরী কোমল দৃষ্টিতে আলোকের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। আস্তে আস্তে বল্‌লে, "আলোকবাবু, আপনাকে আমি চিনি—ভালো

ক'রেই চিনি।" তারপর একটু থেমে আবার বল্‌লে, "কিন্তু এ ক'দিন আপনি কোথায় ছিলেন তা তো কই বল্‌লেন না ? আপনার 'বোহিমিয়ান বন্ধুগুলির সংসর্গে প'ড়ে আমাকে বুঝি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন ?"

আলোক বল্‌লে, "মঞ্জু. বাঙ্‌লাদেশে 'বোহিমিয়ান' নেই। যে জায়গায় স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুর মতন অবাধে মিশতে পারে না, সেখানে 'বোহিমিয়া'র প্রাচ্য সংস্করণ থাকা অসম্ভব। এখানে খালি দাড়ি আর গোঁফ, দেখলে মেজাজ চটে যায়। এদেশে কি ক'রে যে কবিরা কবিতা লেখে, আর লেখকরা উপন্যাস-নাটক রচনা করে, সে হেঁয়ালি তো কিছুতেই আমি বুঝ্‌তে পারি না।"

মঞ্জরী বল্‌লে, "কেন, দেশে এখন স্বাধীন বঙ্গ-মহিলার অভাব তো নেই !"

আলোক হা হা ক'রে হেসে বল্‌লে, "স্বাধীন বঙ্গমহিলা ! কোথায় ? যে মেয়েগুলিকে তুমি 'স্বাধীন' ব'লে মনে কর্‌চ, তাঁরা মোটেই স্বাধীন নন ;—কেবল ঘোম্‌টা খুল্‌লে আর জুতো পর্‌লেই যদি স্বাধীন হওয়া যেত, তাহ'লে স্বাধীনতার কোনই মূল্য থাক্‌ত না !"

মঞ্জরী বল্‌লে, "আপনি কি বল্‌তে চান, আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজেও স্ত্রী-স্বাধীনতা নেই ?"

আলোক দৃঢ়স্বরে বল্‌লে, "নিশ্চয়ই বল্‌তে চাই ! মঞ্জু, কিছু মনে কোরো না, আমি কারুকে অপমান কর্‌বার জন্যে কোন কথা বল্‌চি না,—কিন্তু তোমরা যা পেয়েচ, আমার মতে তা হচ্ছে নকল স্বাধীনতা ! ওহিসাবে গরীব হিন্দু-পরিবারে আর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও তোমাদের মতন,—এমন কি তোমাদের চেয়েও ঢের বেশী স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে। তারাও পুরুষের সাহায্য না নিয়ে কালিঘাটে যায়, পায়ে হেঁটে গঙ্গা নাইতে যায়, অনেক মেয়েকে আমি বাজার ক'রে আন্‌তেও দেখেচি।

তোমরা তাদের চেয়ে কিছুমাত্র অগ্রসর হ'তে পারো নি। পুরুষের সাহায্য ভিন্ন তোমাদেরও একদণ্ড চলে না, তোমাদের সমাজেও পুরুষরা মেয়েদের নিজস্ব সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু ভাব্‌তে পারে না, পুরুষের সম্মতি ভিন্ন তোমাদেরও কোন কাজ করবার সুযোগ নেই, তোমাদেরও পিছনে পিছনে পুরুষের সতর্ক পাহারা অষ্টপ্রহর জেগে থাকে, আর এইতেই বোঝা যায়—তোমাদের ওপরেও পুরুষদের বিশ্বাস বিশেষ প্রবল নয়! যেমন ধর, আজ এখন যদি তুমি বাড়ীর কারুর মত না নিয়ে আমার সঙ্গে বা একলা নিজের ইচ্ছাতেই বেরিয়ে যাও, তারপর ঘণ্টাকয় যেখানে খুসি বেড়িয়ে আসো, তাহ'লে কি হবে?"

—"বাবা বক্‌বেন।"

—"কিন্তু তুমি মেয়ে না হয়ে ছেলে হ'লে কেউ তোমাকে বক্‌তেন না! আজ বাবা বক্‌বেন, কাল স্বামী বক্‌বেন,—এই তো তোমাদের অবস্থা! এরই নাম কি স্বাধীনতা?"

—"কিন্তু বকুনি খাব অন্য কারণে। আমাদের এদেশে নারী এক্‌লা পথে বেরুলে অনেক বিপদের ভয় আছে।"

—"বিপদের ভয় সব দেশেই আছে, কিন্তু য়ুরোপ-আমেরিকার মেয়েরা সে ভয়কে গ্রাহ্যও করে না। যে স্বাধীনতায় মানুষ নিজের ভার নিজেই নিতে পারে না, তাকে স্বাধীন বলা চলে কি?—অবিশ্যি, তোমাদের সমাজে এমন দু-চারটি মহিলা আছেন, যাঁরা সত্যি-সত্যিই স্বাধীনতার বিষয়ে কতকটা অগ্রসর, কিন্তু জানোই তো মঞ্জু, ইংরেজী প্রবাদে বলে, এক কোকিলের ডাকে বসন্ত সাড়া দেয় না! আসল কথা, বাঙ্‌লা দেশে যথার্থ স্ত্রী-স্বাধীনতা নেই,—তা গোঁড়া হিন্দু-সমাজেই বল, নব্য হিন্দু-সমাজেই বল, আর ব্রাহ্ম-সমাজেই বল। কোথাও এ সত্য স্পষ্ট, আর কোথাও অস্পষ্ট—হের-ফের খালি এইটুকু মাত্র।"

মঞ্জরী বললে, "আলোকবাবু আপনি নারীর যে অবাধ স্বাধীনতার কথা বলচেন, হয়ত বাঙলাদেশের ধাতের সঙ্গে তা ঠিক খাপ খাবে না, হয়ত তাতে বাঙালীর সংসারে শান্তির চেয়ে অশান্তিরই সৃষ্টি হবে বেশী মাত্রায়। আচ্ছা, আপনি তো স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষয়ে এতটা উদার, বিবাহের পরেও কি আপনি নিজের স্ত্রীকে এতখানি স্বাধীনতা সত্যিই দিতে পারবেন?"

আলোক উত্তেজিত স্বরে বললে, "এই 'দেওয়া' কথাটাতেই আমি আপত্তি করি। স্বাধীনতা কেউ কারুকে দিতে পারে না, ও-জিনিসটি নিজের জোরে আদায় ক'রে নিতে হয়! তবে এইটুকু আমি বলতে পারি মঞ্জু, আমার স্ত্রী যদি যথার্থই স্বাধীন হন, তবে তাঁর কোনরকম স্বাধীনতা-তেই আমি এতটুকু বাধা দেব না;—তাঁর মনুষ্যোচিত বিবেক-বুদ্ধিই তাঁকে স্বাধীনতার ব্যভিচার থেকে রক্ষা করবে, তার মধ্যে গিয়ে প'ড়ে আমি কখনোই 'স্বামীত্ব' ফলাতে যাব না।"

মঞ্জরী মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিম্ন স্বরে বললে, "আচ্ছা, আচ্ছা—দ্যাখা যাবে, দ্যাখা যাবে,—এ আপনার মুখের কথা কি, মনের কথা!"

আলোক, মঞ্জরীর একখানা হাত সজোরে চেপে ধ'রে আবেগভরে বললে, "হ্যাঁ, দেখবে, দেখবে, দেখবে। কারণ ভবিষ্যতে আমাকে ভালো ক'রে দ্যাখবার সুযোগ তোমার যত হবে, তত আর কারুর হবে না,—একথা আমিও জানি, তুমিও জানো!"

মঞ্জরী মুখ রাঙা ক'রে ব'লে উঠল, "উহুহু—ছাড়ুন, ছাড়ুন আলোকবাবু, আমার হাতখানা মানুষের হাত,—এ আপনার 'গ্রিপ্-ডাম্বেল' নয় যে এত জোরে চেপে ধরেচেন!"

আলোক অপ্রতিভ হয়ে মঞ্জরীর হাত তখনি ছেড়ে দিলে। কাঁচুমাচু মুখে বললে, "মঞ্জু, লেগেচে?"

মঞ্জরী হাতের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বল্‌লে, "তা একটু লেগেচে বৈ কি! বিয়ের পর আপনি যদি এরকম ক'রে আপনার স্ত্রীর হাত ধরেন, তবে সে বেচারী ভরসা ক'রে কোনকালেই স্বাধীন হ'তে পার্‌বে না।"

আলোক বল্‌লে, "আমাকে মাপ কর মঞ্জু! আমি না-জেনে অপরাধ করেচি।"

মঞ্জরী, আলোকের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "না-জেনে অপরাধ কর্‌লেও আইনে শাস্তি পেতে হয়, জানেন তো?"

—"জানি। আমিও শাস্তির জন্যে প্রস্তুত।"

—"আপনাকে এই শাস্তি দেওয়া হোলো যে, আজ আপনি রাতে এখানে না-খেয়ে যেতে পার্‌বেন না।"

আলোক মাথা নেড়ে বল্‌লে, "তবে আমার ভাগ্যে দেখ্‌চি আজ্‌কে আর শাস্তিভোগ করা হয়ে উঠল না। আমার হাতে আজ অনেক কাজ।"

মঞ্জরী ঠোঁট ফুলিয়ে বল্‌লে, "কাজ কাজ, কাজ। ভারি কাজ! না খান না খাবেন, অত মিছে-কাজের ওজর কেন?"

আলোক গম্ভীর হয়ে বল্‌লে, "সত্যি মঞ্জু, গুরুতর কাজে হাত দিয়েচি—আমার মন এখন ভারি অস্থির। আমি তোমার বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা পরামর্শ কর্‌তেই এসেচি। তিনি কোথায়?"

—"বাবা? বাবা যে কাল্‌কেই কি-একটা জরুরী কাজে নাগপুরে গিয়েচেন। ফির্‌তে দেরি হবে!"

—"তবেই তো মুস্কিল।—যাক্, তাহ'লে পরামর্শ করা আর হোলো না। আমি চল্‌লুম।"

—“কিসের পরামর্শ আলোকবাবু, আমাকে বল্‌তে কোন বাধা আছে কি ?”

আলোক একটু ভেবে বল্‌লে, “তোমাকে পরে বল্‌ব। আজ আসি।” —এই ব’লেই হঠাৎ উঠে তাড়াতাড়ি সে চলে গেল।

মঞ্জরী একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, “কাল আস্‌চেন তো ?”

বাইরে থেকে আলোকের জবাব এল—“না।”

কি কাজ, কিসের পরামর্শ ? মঞ্জরী ব’সে ব’সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

নয়

আলোকনাথের সঙ্গে মঞ্জরীর প্রথম পরিচয় হয় রেলপথে, দৈবগতিকে।

মঞ্জরীর পিতা সত্যানন্দবাবু সপরিবারে পশ্চিমে বেড়াতে যাচ্ছিলেন।

পূজোর সময়, গাড়ীতে ভারি ভিড়। যদিও সেখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কাম্‌রা, তবুও তাতে লোক ওঠে-নি কম। সত্যানন্দবাবু স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখেন, তার কোথাও আর তিল-ধারণের ঠাঁই নেই।

গাড়ীর একখানি বেঞ্চি খালি ছিল, কিন্তু সেখানিও রিজার্ভ করা। অন্যান্য বেঞ্চির লোকগুলি তাঁদের দিকে চেয়ে নীরব মূর্ত্তির মত বসে রইল, অন্তত মহিলা-দুজনের জন্যে যে একটু জায়গা ক'রে দেওয়া উচিত, এটুকুও তাদের কারুর নিরেট মগজে ঢুক্‌ল না।

সত্যানন্দবাবু অসহায় ভাবে বল্‌লেন, "আজ দেখ্‌চি, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই যেতে হবে!"

এমন সময় একটি যুবক 'প্লাট্‌ফর্ম্ম' থেকে গাড়ীর ভিতরে এসে ঢুক্‌ল।

মহিলা-দুজনের অবস্থা দেখে সত্যানন্দবাবুকে সে বল্‌লে, "এ কি, আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, ঐ বেঞ্চিখানায় গিয়ে বসুন না!"

—"ওখানা যে রিজার্ভ করা!"

—"তাতে কি হয়েচে, আমিই রিজার্ভ ক'রে রেখেচি। মেয়েদের নিয়ে আপনি ওখানে গিয়ে বসুন।"

ধন্যবাদ দিয়ে, একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সত্যানন্দবাবু স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে সেই বেঞ্চিখানার উপরে গিয়ে বস্‌লেন। যুবকও একটা ট্রাঙ্ক টেনে নিয়ে তার উপরে ব'সে পড়্‌ল।

সত্যানন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "ওকি, ওকি! ওখানে কেন, এইখানেই আসুন, জায়গা রয়েচে যে!"

যুবক বল্লে, "আমার জন্যে ভাব্বেন না, আপনারা হাত-পা ছড়িয়ে ভালো ক'রে বসুন।"

—"বিলক্ষণ! আপনারই রিজার্ভ-করা জায়গা, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আমরা কি উড়ে এসে জুড়ে বস্তে পারি?"

—"খুব পারেন। ওঁরা মহিলা; আর আপনি প্রাচীন। আপনারা যে কষ্ট সইতে পার্বেন না—আমি তা অনায়াসে পার্ব!"

গাড়ীর অন্যান্য কয়েকজন আরোহীর সবজান্তা মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠ্ল। সে হাসির অর্থ খুব স্পষ্ট।—সুন্দর মুখ দেখেচে কিনা, ছোক্রার ভদ্রতার আর সীমা নেই! সে হাসি সত্যানন্দ বাবুও দেখ্লেন, যুবকও দেখ্লে, তার অর্থ বুঝ্তেও তাঁদের দেরি হোলো না—দুজনেই গম্ভীর হয়ে গেলেন।

খানিক পরে ষ্টেশনের হৈ-চৈ আর গরম বদ্ধ বাতাসের ভিতর থেকে গাড়ী ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ময়দানের উপর দিয়ে ছুট্ মার্তে সুরু কর্ল।

সত্যানন্দবাবু যুবককে জিজ্ঞাসা কর্লেন, "মশায়ের নামটি জান্তে পারি কি?"

—"অনায়াসে। আলোকনাথ রায়।"

—"কি করা হয়?"

—"ভণ্ডামী।"

সত্যানন্দবাবু ভাব্লেন, তিনি শুন্তে বুঝি ভুল কর্লেন। আবার সুধোলেন, "আজ্ঞে, কি বল্লেন?"

আলোকনাথ হেসে বল্লে, "কুস্তি লড়ি, ডাম্বেল ভাঁজি, লাঠি খেলি—

অর্থাৎ পাড়ার লোকের মতে, আমি গুণ্ডামি করি, বা কর্‌বার ফিকিরে আছি।”

সত্যানন্দবাবু হা হা ক'রে হেসে উঠে বল্‌লেন, “এ ছাড়া আর কিছু করেন না?”

—“না। বাবা যৎকিঞ্চিৎ রেখে গেছেন, তাই নাড়ি-চাড়ি আর খাই-দাই-ঘুমোই।”

—“পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েচেন তাহ'লে?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ। এম-এ পাস কর্‌বার পরে কলেজের ওপরে অরুচি ধ'রে গিয়েচে।”

আলোকের কথা কইবার ধরণ দেখে সত্যানন্দবাবু আবার না হেসে থাক্‌তে পারলেন না, মঞ্জরী আর তার মাও মুখ টিপে টিপে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। এম্‌নি আলাপ-পরিচয়, গল্পগুজবের মাঝখানে ট্রেণ বর্দ্ধমানে এসে থেমে পড়্‌ল।

একজন সাহেব ষ্টেশন থেকে কাম্‌রার ভিতরে এসে ঢুক্‌ল, সঙ্গে তার একটা কুকুর আর কতকগুলো মাল।

সাহেব একবার কাম্‌রার চারিদিকে ঈগলের মত তীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়ে নিলে,—কিন্তু সেই কালোর দলের ভিতরে এমন একটুও ফাঁক্ পেলে না যেখানে তার শ্বেত চরণের ব্রাউন পাদুকার ঠাঁই হ'তে পারে।

খাঁটি ইংরেজ,—রাজার জাতি; অতএব এমন অবস্থায় রাগ হবারই কথা। রাগে অধীর হয়ে শ্বেতাঙ্গপুঙ্গব যেসব বাক্য উচ্চারণ কর্‌লেন, এখানে তার বাংলা তর্জ্জমা দেওয়া হোলো।

সত্যানন্দবাবুর ঠিক সুমুখের বেঞ্চে একটি হোম্‌রা-চোম্‌রা ও হাতীর মত নাদুস্-নুদুস্ বাবু, সারা পথ মঞ্জরীর দিকে ড্যাব্‌ডেবে চোখে প্যাট্‌-প্যাট্ ক'রে চেয়ে, ঝাঁটা গোঁপে মোচড় দিতে দিতে আস্‌ছিলেন। চোখ দিয়ে

যদি মানুষ খাওয়া চল্‌ত, তাহ'লে মঞ্জরী এতক্ষণে নিঃসন্দেহে নিঃশেষে হজম হয়ে যেত। সেই বিস্ফারিত চক্ষের বুভুক্ষু দৃষ্টির জ্বালায় মঞ্জরী ভারি বিব্রত হয়ে পড়েছিল।

সাহেব প্রথমেই সেই বাবুটির কাছে গিয়ে তাচ্ছীল্যের স্বরে বল্‌লে, "বাবু, ওঠো!"

বাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আপত্তি জানিয়ে ভয়ে ভয়ে বল্‌লেন, "গাড়ীতে জায়গা নেই, উঠে যাব কোথায় স্যার?"

—"নরকে যাও! আমি বল্‌চি—ওঠো!"

বাবু অসহায় ভাবে কাম্‌রার অন্যান্য আরোহীর মুখের পানে তাকালেন —কিন্তু সকলেই তখন অত্যন্ত অন্যমনস্কের মত নির্লিপ্ত ভাবে মুখ ফিরিয়ে ষ্টেশনের জনতার দিকে চেয়েছিলেন—গাড়ীর মধ্যে কি হচ্ছে না-হচ্ছে সে বিষয়ে কারুরই যেন এতটুকু খেয়াল নেই। কেবলমাত্র আলোকনাথ হাসিমুখে বাবুটির ধরণ-ধারণ ব'সে ব'সে নিরীক্ষণ করছিল।

আলোকনাথের দিকে করুণ চোখে চেয়ে বাবুটি বল্‌লেন, "দেখ্‌চেন মশাই, অন্যায়টা!"

আলোকনাথ বল্‌লে, "দেখ্‌চি বৈ কি! কিন্তু আপনি অন্যায় সইচেন কেন?"

—"সায়েবকে দয়া ক'রে বুঝিয়ে বলুন না!"

—"আমার বয়ে গেছে! আপনি তো স্ত্রীলোক নন,—কাপুরুষের ওপরে আমার কোন দয়া নেই!"

এদিকে বাবুর উঠ্‌তে দেরি দেখে সাহেবের ধৈর্য্য যার-পর-নাই বেসামাল হয়ে পড়্‌ল। "ওরে কালা নিগার, এখনো উঠ্‌লিনে"—এই ব'লে সে বাবুর কাণ ধ'রে একটানে তাঁকে বেঞ্চি থেকে উঠিয়ে, এককোণে ঠেলে সরিয়ে দিলে। তারপর বাবুর পাশের ভদ্রলোকের (যিনি তখনো

উদাস চোখে জান্‌লা দিয়ে ষ্টেশনের দিকে চেয়ে ছিলেন) সাম্‌নে গিয়ে সাহেব বল্‌লে, বাবু, তোমাকেও কাণ ধ'রে তুলতে হবে, না—"

সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে উঠে পড়ে, একেবারে গাড়ীর আর-একদিকে স'রে গিয়ে দুর্জ্জনকে সুদূরে পরিহার কর্‌লেন।

সাহেব হেসে তাঁর দিকে চেয়ে বল্‌লে, "ধন্যবাদ! বাবু, তুমি একটি নিখুঁত ভদ্রলোক!"

উত্তরে 'নিখুঁত ভদ্রলোকটি'ও কিঞ্চিৎ হাস্য বা হাস্যের ভাণ কর্‌লেন।

সাহেব বেঞ্চের উপরে নিজের কুকুরটাকে তুলে দিয়ে বল্‌লে, "রোভার, ভদ্রলোকরা তোমার সম্মানের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়েচেন, অতএব তুমিও ল্যাজ্‌ নেড়ে ওঁদের ধন্যবাদ দাও!"

রোভার অবশ্য জিভ বার ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে ল্যাজ্‌ নাড়্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু সেটা ধন্যবাদ জানাবার জন্যে কি না, তা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

বেঞ্চির উপরে তখনো আরো তিনজন লোক বেজায় আড়ষ্ট হয়ে বসেছিলেন। সাহেব কিন্তু যেই বল্‌লে "এইবার আমার জন্যে তোমরা জায়গা ক'রে দাও," অম্‌নি সুবোধ গোপালের মতন তাঁরা তিনজনেই বিনাবাক্যব্যয়ে একসঙ্গে গাত্রোত্থান কর্‌লেন।

সত্যানন্দবাবু চুপি চুপি বল্‌লেন, "আলোকবাবু, এ দৃশ্য যে আর দেখা যায় না, ছি ছি, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্চে—আপনি কিন্তু হাস্‌চেন কোন্ প্রাণে?"

আলোকনাথ আহত স্বরে বল্‌লে, "সত্যানন্দ বাবু, আমি তো হাস্‌চি না—হাসির মুখোসে আমি প্রাণের লজ্জাকে চেপে রাখচি!"

এদিকে সমস্ত বেঞ্চিখানা পুরোপুরি দখল ক'রেও সাহেবের মনের

আশ মিট্‌ল না,—জিনিস-পত্তরগুলো এদিকে-ওদিকে তুলে, একটা বড় ব্যাগ নিয়ে মঞ্জরীর পাশে রেখে দিলে।

—সঙ্গে সঙ্গে আলোকনাথ দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। পরম শান্ত ভাবে এগিয়ে গিয়ে, সাহেবের ব্যাগটা তুলে নিয়ে যেন কিছুই নয়—এম্‌নি সহজে জান্‌লা গলিয়ে ষ্টেশনের দিকে নিক্ষেপ কর্‌লে! গাড়ী তখন ফের চল্‌তে সুরু করেছে।

এ-হেন ব্যাপার যে ব্রিটিশ-রাজত্বে সম্ভব, সাহেব বোধ হয় তা স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারেনি। বিষম ক্রোধাবেগে স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ সে ব'সে রইল—তারপর কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুসি পাকিয়ে বল্‌লে—"ইউ ডার্টি বেঙ্গলী! আই স্যাল টিচ্ ইউ, হাউ এ জেণ্ট্‌লম্যান ট্রিট্‌স্ হিজ্ ডগ!"

"কি! কি বল্‌লে?"—বল্‌তে বল্‌তে চোখের নিমেষে আলোকনাথ সাহেবের দুই কাঁধ পাথরের মত শক্ত দুই হাতে চেপে ধর্‌লে, তারপর অবহেলায় তাকে শূন্যে তুলে কাম্‌রার দরজার কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলে!

সাহেব অনেকক্ষণ সেইখানেই আচ্ছন্নের মত বসে রইল। তারপর যখন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, আলোকনাথ কর্কশস্বরে বল্‌লে, "অসভ্য জানোয়ার! ফের যদি একটি কথা কইবে, তাহ'লে তোমার ব্যাগের মতন তোমাকেও আর গাড়ীর ভেতরে রাখ্‌ব না।" এই ব'লে সে আবার নিজের ট্রাঙ্কের উপরে গিয়ে ব'সে পড়্‌ল।

রাগে, লজ্জায়, অপমানে ঘাড় হেঁট্ ক'রে সাহেব পাষাণে-পরিণত নরমূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আলোকনাথের অপরিসীম বাহুবলের যেটুকু নমুনা সে পেয়েছিল, তার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্টরও অতিরিক্ত হোলো।

পরের ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌তেই, সাহেব নিজের কুকুর আর মাল নিয়ে সে কাম্‌রা থেকে নেমে প'ড়ে, অন্য কাম্‌রায় গিয়ে উঠ্‌ল।

স্থানচ্যুত ভদ্রলোকরা এতক্ষণ অবাক হ'য়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন; সাহেব অদৃশ্য হ'তেই আবার হাঁপ ছেড়ে যে যার জায়গায় গিয়ে বস্‌লেন।

সেই প্রথম ভদ্রলোক, যিনি সাহেবের 'কাণমলা' ভক্ষণ করেছিলেন, তিনি আবার নিশ্চিন্তভাবে মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে গোঁফে মোচড়ের পর মোচড় দিতে সুরু কর্‌লেন!

আর-একজন বল্‌লেন, "সায়েব-ব্যাটা বোধহয় নালিশ কর্‌বে!"

তৃতীয় ব্যক্তি বল্‌লেন, "ব্যাগটা একেবারে বাইরে ফেলে না দিলেও চল্‌ত, ভেতরে দামী জিনিস থাক্‌তে পারে।"

চতুর্থ ব্যক্তি বল্‌লেন, "হ্যাঁ, কাজটা ভালো হয় নি। পুলিস-কেস হ'তে পারে।"

আলোকনাথ কোন জবাব দিলে না।

কিন্তু মঞ্জরী আর থাক্‌তে পার্‌লে না, তীব্রস্বরে ব'লে উঠল—"সেজন্যে আপনাদের মাথা-ব্যথার দরকার নেই! পুলিস-কেস হ'লেও আপনাদের কেউ সাক্ষী হ'তে ডাক্‌বে না।"

সত্যানন্দবাবু বল্‌লেন, "মঞ্জু! তুমি চুপ কর!"

আলোকনাথ বল্‌লে, "হ্যাঁ, এই কাপুরুষগুলোর সঙ্গে কথা কওয়াও অপমান। ওরা যা-খুসি ব'কে যাক্—ঐটুকুই কাপুরুষের সান্ত্বনা। ভ্যাড়ার শিং নেই, কিন্তু সেও মুখে চ্যাঁচাতে পারে।"

এম্‌নি ক'রেই মঞ্জরীর সঙ্গে আলোকের প্রথম পরিচয়। সবল পুরুষত্ব নারীকে যতটা আকর্ষণ করে, ততটা আর কিছু নয়। আলোকনাথের চেহারা তো সুশ্রী ছিল বটেই, তার উপর তার অসাধারণ দৈহিক শক্তির

সঙ্গে শিশুর মতন সরল ও দিনের আলোর মত স্বপ্রকাশ চরিত্র সকলকেই অভিভূত কর্‌ত। তাই প্রথম দিনেই মঞ্জরীর তরুণ মনের উপরে আলোকনাথ তার নিজের অজ্ঞাতেই গভীর রেখাপাত কর্‌তে পেরেছিল।

মঞ্জরীও যে আলোকনাথের চোখকে রূপের নেশায় রঙিন ক'রে তুলেছিল, সে কথাও বলা বাহুল্য। কারণ, মঞ্জরীর টানা টানা, ডাগর, ঢুলে-পড়া চোখের মধুর দৃষ্টি-লীলা, গোলাপ-কোরকের আধখোলা পাপ্‌ড়ির মতন পাত্‌লা দুখানি অধরে হাসির মৃদু-আভাস, শিল্পীর স্বপ্ন-কল্পনার মতন নিখুঁত ও সুঠাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বচ্ছন্দ-ছন্দভরা সঞ্চালন-শ্রী একবার দেখ্‌লেই আর ভুলবার যো ছিল না।—সে যেন একখানি ছবি! গীতি-কবিতার একটি লাইন! বিজলীর একটি রেখা! অপূর্ব্ব, বিচিত্র, স্বর্গীয়। ভুল্‌বার যো কি!

ট্রেণ থেকে নেমে বিদায় নেবার সময়ে সত্যানন্দ বাবু আলোকনাথকে ব'লে গেলেন, "আশা করি কলকাতায় ফির্‌লে আবার আপনার দেখা পাব?"

আলোকনাথ বল্‌লে "নিশ্চয়।"

কল্‌কাতায় দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎকারের পরে, আলোকনাথের সঙ্গে মঞ্জরীর পরিচয় ক্রমেই আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল। অবিবাহিত দুই যুবক-যুবতীর তরুণ হৃদয়!—ঠিক যেন ঘুঁড়ি আর লাটাইয়ের মতন! পরস্পরের টানে আকৃষ্ট হ'তে বিলম্ব ঘট্‌ল না।

সত্যানন্দবাবুও আলোকনাথকে নিজের লোকের মতন ভালো বাসতেন। যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গেই তিনি আলোকনাথের জীবনের সাধনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাহিনী শ্রবণ কর্‌তেন। বাঙালীকে সে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্‌বে। বাঙালীর রোগদুর্ব্বল, ক্ষণভঙ্গুর, কুৎসিত ও পঙ্গু দেহকে সে সতেজ, বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যসুন্দর ও দীর্ঘজীবি ক'রে তুল্‌বে। পঁচিশ বৎসর

পরে বাঙালীর ভীরুতা ও কাপুরুষতার কথা অতীতের বিস্মৃত স্মৃতি হবে। বিশ্বের পুরুষ-সভায় বাঙালীর বীরত্বে জয়ধ্বনি উঠ্‌বে। দেশকে সে বুঝিয়ে দেবে, দুর্ব্বলের সাহিত্য বৃথা, রাজনীতি বৃথা, স্বরাজের আন্দোলন বৃথা—জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী হ'তে হ'লে, সংসারের দুর্গম পথে চল্‌তে হ'লে সর্ব্বাগ্রে চাই মহাশক্তির সাধনা! দেহের শক্তি না থাক্‌লে মনের শক্তি থাকা অসম্ভব।

—এই সব কথা বল্‌তে বল্‌তে আলোকনাথের মাথা উঁচু হয়ে, চক্ষু দীপ্ত হয়ে, বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠ্‌ত! শক্তির ভরা জোয়ার যেন তখন তার সারা দেহের উপর দিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে বয়ে যেতে থাক্‌ত!

সত্যানন্দবাবুর মতন সাগ্রহে আর কেউ আলোকনাথের এই আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুন্‌তও না, এমন অকৃত্রিম উৎসাহও সে আর কারুর কাছ থেকে পেত না। তাই সেও তার শক্তি-প্রচার-ব্রত সম্বন্ধে পরামর্শের দরকার হ'লে সব-আগে সত্যানন্দবাবুর কাছেই ছুটে আস্‌ত।

সত্যানন্দবাবু যখন দেখ্‌লেন, আলোকনাথের সঙ্গে মঞ্জরীর ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে, তখন তিনি চক্ষুলজ্জার খাতিরে পিতার কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হলেন না। আলোকনাথকে একদিন ডেকে বল্‌লেন, "দেখ আলোক, মঞ্জুর সঙ্গে তোমার মেলা-মেশায় আমার কোনই আপত্তি নেই, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, এই বন্ধুত্ব শেষটা বিপদের কারণ না হয়ে ওঠে।"

—"কেন?"

—"কারণ তুমি হিন্দু, আর আমরা ব্রাহ্ম।"

—"তাতে হয়েচে কি?"

—"মঞ্জু যদি মনে মনে তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করে, তবে তোমাদের সমাজ তাতে বাধা দিতে পারে।"

—"আমি সমাজের ভয় রাখি না।"

—"কিন্তু তোমার আত্মীয়-স্বজন?"

—"আমার এমন কোন আত্মীয় নেই, আমার ওপরে যাঁর প্রভুত্ব আছে। আমি স্বাধীন।"

—"কিন্তু এমন বিবাহে তোমার মত্ আছে?"

—"সম্পূর্ণ।"

সত্যানন্দবাবুর মন থেকে একটা ধোঁকা কেটে গেল। রূপে-গুণে যে আলোকনাথের মত সুপাত্র দুর্লভ, এটা তিনি বিলক্ষণই জান্‌তেন। সুতরাং সেইদিন থেকেই তাকে তিনি নিজের জামাই ব'লে ভাব্‌তে একটুও আর ইতস্তত কর্‌লেন না। এখন কেবল একটি শুভদিনের অপেক্ষা।

দশ

আলোকনাথের নিযুক্ত চরেরা দিনে দিনে যেসব খবর সংগ্রহ ক'রে আন্‌ছে, তা শুনে সে ক্রমেই স্তম্ভিত হয়ে যেতে লাগ্‌ল। সমাজের ভিতরে ভিতরে যে পুরুষের পশুত্বের এত ইতিহাস, অমানুষের নিষ্ঠুরতার এত কাহিনী, অসহায় নারীত্বের উপরে এত অত্যাচার, এত যথেচ্ছাচার গোপন হয়ে আছে, এটা সে কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা কর্‌তে পারে নি।

অথচ এই বৃহৎ সমাজ সহজ ভাবে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে আছে! সে নির্ম্মম কৌতুকে দণ্ডাঘাত করে, কিন্তু সুবিচার করে না। প্রবলকে সে অব্যাহতি দেয়, পাপীকে ক্ষমা করে, কিন্তু সবলের চক্রান্তে দুর্ব্বল যদি নিজের অজ্ঞাতেও ধূলায় লুটিয়ে পড়ে, তবে সেই 'দোষে'ও নির্দ্দোষের উপরে সে চির-নির্ব্বাসন দণ্ডদান ক'রে নরকের অন্ধকারে পাঠিয়ে দিচ্ছে!·········সমাজের ভিতরে এ অভাগীদের যদি নিতান্তই রাখা না চলে, তবে সমাজের বাইরেই যাতে তারা কোন নিরাপদ স্থানে সৎভাবে থাক্‌তে পারে, এটুকু ব্যবস্থাও করা হয় না কেন? কি জন্যে এতগুলি অনিচ্ছুক, অনভিজ্ঞ জীবকে একেবারে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়?

অবশ্য, সতীত্বের মর্য্যাদা সব দেশেই আছে। তবু এ কথা খুবই সত্য যে, য়ুরোপ-আমেরিকায় যারা রীতিমত অসতী, তাদেরও সুরুচিসঙ্গত ভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ কর্‌বার অগুন্তি উপায়ের অভাব নেই। রঙ্গালয়ের নটীরা সেখানে এদেশের মত অসামাজিক একঘরে জীব নয়। সেখানে যে নর্ত্তকীরূপে এই শ্রেণীর অসংখ্য কুচরিত্র নারীও কাজ করে, এ তো প্রকাশ্য গুপ্তকথা। তাছাড়া আপিসে ও দোকানেও এই দলের স্ত্রীলোকরা গরীব. পরিশ্রমী, সৎচরিত্র মহিলাদের সঙ্গেই অনায়াসে কাজকর্ম্ম কর্‌তে পারে।

যে দেশে অসৎ নারীদেরও নিষ্পাপ উপায়ে জীবিকার ভাবনা নেই, সে দেশেও পতিতা ব'লে সৎ-সমাজে যারা হেয় বা একঘরে হয়, সমাজ তাদের একেবারে জঞ্জালের মত দূরে ফেলে দেয় না। তাদের মধ্যে যারা অনুতাপী, সমাজ সে অভাগীদের সোধ্‌রাবার অবকাশ দেয়। যারা দৈব-গতিকে পতিতা নাম কিনেছে, সমাজ তাদেরও যোগ্য ব্যবস্থা করে। এজন্যে সেখানে নানা আশ্রমের অভাব নেই।

কিন্তু এই বাঙ্‌লা দেশে মুহূর্ত্তের ভুলে, দৈব গতিকে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে, পুরুষের পশু-প্রবৃত্তিতে যারা একবার পতিতা হয়েছে, পাপের উপরে যাদের দারুণ ঘৃণা, আকস্মিক পদস্খলনের জন্যে যারা অনুতাপে হাহাকার করে, সমাজ থেকে তাড়িত হ'লে তাদের পাপ-পথ ভিন্ন জীবিকা-নির্ব্বাহের এমন কোনই উপায় নেই, যা সম্মানজনক বা ভদ্রমহিলার উপযোগী। এক পরের বাড়ীতে ঝী হয়ে থাকা, কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়ের পক্ষে তা অসম্ভব এবং সে কাজও নিরাপদ, গ্লানিশূন্য বা রুচিসঙ্গত নয়। এদেশে এমন কোন আশ্রমও নেই, নির্ব্বাসিতা নারীর যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে পবিত্র ভাবে কোন কাজ ক'রে বেঁচে থাক্‌তে পারে! সমাজের অন্যায়, নিষ্ঠুর ও যুক্তি-হীন ব্যবহার দেখে দারুণ ক্রোধ এ ঘৃণায় আলোকনাথের হৃদয়টা পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

মনের গোপন পাপ-বাসনা প্রকাশ্য পাপ-কার্য্যের চেয়ে কোন অংশেই ভালো নয়—দুইই সমান নিন্দনীয়। সংসারে এমন অনেক মহাপাপী সাধু-নামে বিখ্যাত হয়ে সুখে-সম্মানে আছে, কারাগারের যে-কোন অপরাধীর চেয়ে তাদের মন অধিকতর ঘৃণ্য। তবে যে তারা হাতে-নাতে কোন অপরাধ ক'রে দাগী হয়নি, তার দুই কারণ থাক্‌তে পারে। হয় তারা কাপুরুষ, সাহসের অভাবেই পাপ কাজ কর্‌তে ভয় পায়;—নয় তাদের পাপ-কাজের সুযোগ হয় নি। কিন্তু পৃথিবীর আদালতকে ফাঁকি

দিলেও, যদি পরলোক থাকে, ভগবান থাকেন, তবে এদের বিচার মাথার উপরে তোলা আছে।

আসল কথা, কাজ দেখে নয়,—মন দেখেই মনুষ্যত্বের বিচার। মনে যার পাপ-ইচ্ছা নেই, সে যদি নিজের অজ্ঞাতসারে, বা পাশব অত্যাচারে কোন অন্যায় কাজ ক'রে ফেলে, কি কর্‌তে বাধ্য হয়, তবে কেন সে নিন্দিত, ঘৃণিত, অপমানিত বা পরিত্যক্ত হবে? কেন, কোন্ যুক্তি-অনুসারে? পৃথিবীর যে-কোন কঠিন বিচারকও তাকে ক্ষমা কর্‌বেন, কিন্তু সমাজ তা কর্‌বে না কেন? ক্ষমা না করুক্, অন্ততঃ তার জন্যে কোন মন্দের-ভালো ব্যবস্থা কর্‌বে না কি কারণে? তাহ'লে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতা রইল কোথায়?

যে সব নির্ব্বাসিতার ইতিহাস আলোকনাথ জান্‌তে পার্‌লে, তার মধ্যে পাপিষ্ঠাও ছিল অনেক, নির্দ্দোষ আত্মাও ছিল অনেক। আলোকনাথ হিসাব ক'রে দেখ্‌লে, পতিতাদের পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। (১) বারবনিতার গর্ভে জ'ন্মে পতিতা। (২) পাপ-ইচ্ছায় কুলত্যাগ ক'রে পতিতা। (৩) পুরুষের কৌশলে, প্রলোভনে ভুলে পতিতা। (৪) নিজের মুহূর্ত্তের ভ্রমে পতিতা—পরে অনুতপ্তা। (৫) দুষ্টের আক্রমণে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে পতিতা।

আলোকনাথ আরো দেখ্‌লে, কেবল রাধারাণী নয়, বাঙ্‌লার গ্রামে গ্রামে ঠিক তারই মত অসংখ্য রমণী, হঠাৎ একদিন নর-পশুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, চিরদিনের মতন বিনাদোষে সমাজের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মুকুলমালার মতনও অনেক সতীসাধ্বীকে হরণ ক'রে আনা হয়েছে। আরো অনেকের মধ্যে কেউ-বা কল্‌কাতায় গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, কেউ-বা রেল-ষ্টেশনে দলছাড়া হয়ে পড়েছিল, কেউ-বা অত্যাচারী স্বামী বা আত্মীয়ের দ্বারা পথে বিতাড়িত হয়েছিল, তারপর

কোন দুষ্ট নর বা নারীর স্তোকবাক্যে ভুলে কু-স্থানে এসে ঢুকেছিল, পরে নিজের ভ্রম বুঝেও ফাঁদে-পড়া পাখীর মতন আর পালাতে পারেনি!

হতভাগ্য জীবনের সেই করুণ কাহিনীগুলি শুনতে শুনতে আলোকনাথের চোখ সজল হয়ে উঠ্‌ত। দৈব-দুর্ঘটনা সময়ে সময়ে যে কতদূর ভয়ানক হয়, এক-একটি নারী-জীবনে তার প্রমাণ পেয়ে আলোকনাথ স্তম্ভিত হয়ে যেত। কিন্তু এই সব পতনের ইতিহাসের অধিকাংশ পৃষ্ঠাই পুরুষের পাপের ছাপে কলঙ্কিত। একটি কাহিনী সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। এখানেও পুরুষের দোষে শাস্তি ভোগ কর্‌ছে, নারী! *

বাবুটি উকীল। বিবাহ হয়েছে। কিন্তু একমাত্র স্ত্রীতে অনেক ভ্রমর-প্রকৃতি পুরুষের মনের সাধ ষোলআনা মেটে না—তাঁরও মেটেনি। তবে তিনি যে কুচরিত্র নন, সেটা প্রমাণিত কর্‌বার জন্যে বাবু কুস্থানে না গিয়ে, প্রথম পক্ষের উপরেই ফাউ-স্বরূপ দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন কর্‌লেন। হোলোই বা একের উপরে দুই,—বিয়ে-করা, আইন-সঙ্গত স্ত্রী তো বটে! সুতরাং বাবুর 'চরিত্র' যে রক্ষা পেলে, তাতে আর সন্দেহ নেই! †

পক্ষে যখন দ্বিতীয়, তখন পক্ষপাতিতাও দ্বিতীয় পক্ষের উপরেই যদি কিঞ্চিদধিক হয়, তবে বাবুর বিপক্ষেও কিছু বলা সাজে না। কারণ এ যে স্বাভাবিক! অতএব এক্ষেত্রেও প্রথম পক্ষ ক্রমেই বাবুর চক্ষুশূল হয়ে উঠ্‌ল।

* বিশ্বাস হোক্ আর নাই-ই হোক্, কিন্তু এই কাহিনীটি আগা-গোড়া সত্য—একটুও অত্যুক্তি নয়। নায়ক-নায়িকার নাম-ধামও আমরা জানি।

† চরিত্র-রক্ষা সম্বন্ধে বাঙালীর ধারণা যার-পর-নাই চমৎকার!—এদেশের কোন রাজসম্মানে ভূষিত বিখ্যাত ডাক্তার বৃদ্ধ বয়সে তৃতীয় কি চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করেছিলেন। সেজন্যে এক বন্ধু তাঁকে তিরস্কার করাতে তিনি বলেছিলেন, "কি করব বল ভাই, বুড়ো-বয়সে পাছে শেষটা চরিত্রহীন হ'তে হয়, সেই ভয়েই বাধ্য হয়ে বিয়ে কর্‌লুম!" এই শ্রেণীর 'সুচরিত্র' সাধু বাঙলা দেশে অগুন্তি আছে। কিন্তু তারা যে পুরুষমানুষ, সমাজও তাই বোবা!

কিছুদিন যায়। কল্‌কাতার বিদ্রোহী মক্কেলদের নিষ্ঠুর বেআক্কেলিতে কিছুকাল রৌপ্যকষ্ট ভোগ ক'রে, এখানকার পসা তুলে বাবু পশ্চিমের ছাতুর ক্ষেত্রে ভাগ্য-পরীক্ষায় যাত্রা করলেন—সঙ্গে রইল প্রিয়-অপ্রিয় দুই পক্ষই।

মাঝের একটা ষ্টেশনে নেমে প'ড়ে বাবু স্ত্রী-কামরায় গিয়ে বল্‌লেন "ওগো, এখানে গাড়ী-বদল করতে হবে। নেমে এস।"

যুগল-স্ত্রী স্বামীর আদেশ পালন করলেন। "অপেক্ষা-গৃহে" গিয়ে বা প্রথম স্ত্রীকে বল্‌লেন, "তুমি এখানে বোসো। ভারি ভিড়, একেবারে দুজনকে সাম্‌লাতে পারব না—একে একে দুজনকে নিয়ে যাব। আগে একেই নিয়ে যাই।"—এই ব'লে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের হাত ধ'রে প্রস্থা করলেন।

তারপর কয় বৎসর কেটে গেছে। বাবু আর ফেরেননি। বো হয় 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা' এই উক্তিটি তিনি প্রথম পক্ষের উপরেই খাটিয়ে পথে আর তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না। প্রথম স্ত্রীও অবশ্য "অপেক্ষা-গৃহে ব'সে অদ্যাবধি স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছে না। বাঙালীর কুলবধূ লজ্জা বতী লতা—বাহিরের বিশ্বে একান্ত অসহায়। দুষ্টলোক এমন সুযো ছাড়ে না। পথে নির্ব্বাসিত হয়ে আজও সে পথের ধূলোতেই লুটোচ্ছে- এখন সে পতিতা!

এই বিচিত্র—কিন্তু মর্ম্মভেদী কাহিনী যতবার মনে পড়ে, ততবা আলোকনাথের দেহের শিরায় শিরায় তপ্ত রক্ত-ধারা উছ্‌লে ওঠে কাহিনীর নায়ককে পুরুষ ব'লে সমাজ অনায়াসে ক্ষমা করেছে বটে, কি তাকে হাতের মুঠোর ভিতরে পেলে, আলোকনাথ বোধ করি ফাঁসীকাঠে ভয় রাখ্‌তে না।

আলোকের বন্ধু বিমল পুলিস-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তা

সাহাযে সে চর লাগিয়ে অধঃপতিত নারীত্বের এই-সব শোচনীয় অশ্রুসিক্ত কাহিনী সংগ্রহ করেছে। অনেক ভেবে-চিন্তে সে নিজের কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেল্‌লে,

আলোকের চরিত্র যেমন সরল, তেমনি সদয়।—পরের দুঃখে তার প্রাণ [illegible] ীয়-অনাত্মীয়ের বাছ-বিচার না রেখে। তার উপরে, কোন-বিষয়ে একবার কর্ত্তব্য স্থির করলে সে পাহাড়ের মতন অটল হয়ে থাকৃত—তখন সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধতাও গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌ত না।

সেদিন রাধারাণী বসে বসে মুকুলমালার কাছে রবীন্দ্রনাথের "ঘরে-বাইরে" প'ড়ে শোনাচ্ছিল। মুকুলমালা যাতে অন্যমনস্ক হ'তে পারে, রাধারাণী এখন সর্ব্বদাই সেই চেষ্টায় আছে।

শুন্‌তে শুন্‌তে মুকুলমালা ব'লে উঠ্‌ল, "দিদি, সন্দীপ কি ভয়ানক লোক!"

রাধারাণী বই থেকে মুখ না তুলেই বল্‌লে, "এই তো আসল পুরুষ-চরিত্র! এরা এম্‌নি ক'রেই বড় বড় ছাঁদা কথার ফাঁক্ দিয়ে অবোধ মেয়েমানুষের মনের ভিতরে ঢুক্‌বার ফিকিরে থাকে। এদের মহত্বের মুখোসের তলায় যে দানবের মুখ লুকানো আছে, আমরা তা আগে দেখ্‌তে পাই না, কাজেই ফাঁদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই—বাঁশীর ডাকে হরিণীর মত!"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুকুলমালা বল্‌লে, "দিদি, পুরুষের কোন গুণই তুমি দেখ্‌তে পাওনা,—কিন্তু পুরুষের ভেতরে তো নিখিলেশও আছে!"

রাধারাণী বল্‌লে, "কে জানে! হয়ত এটিতে লেখক আদর্শ গড়্‌তে চেয়েছেন। আদর্শ কেতাবেই থাকে, সংসারে তাকে চোখে দেখা যায় না।"

—দরজার কাছে মাটির উপরে কার ছায়া পড়েছে দেখে রাধারাণী বল্‌লে, "কে?"

আলোকনাথ ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "তোম[illegible] গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিলুম। কিন্তু রাধারাণী, আমি 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশের মত নর-দেবতা নই বটে, তবে সন্দীপের মত নর-দানবও নই। পুরুষ তোমার চোখে পশু ছাড়া আর কিছুই নয়, আমি তা বেশ জানি। কিন্তু আমার বেলায় দয়া ক'রে একটুখানি সদয় হোয়ো, কারণ অত ঘৃণা আমি সইতে পারি না—সইতে শিখিনি!"

রাধারাণী বই মুড়ে লজ্জায় মাথা হেঁট্ ক'রে বল্‌লে, "মাপ্ কর্‌বেন আলোকবাবু, আমি কথার পিঠে কথা বল্‌ছিলুম, অত-শত ভেবে দেখি-নি। যদি জান্‌তুম—"

—"যে, আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুন্‌চি, তাহ'লে অন্তত চক্ষু-লজ্জার খাতিরেও আমার সাম্‌নে তুমি পুরুষের অত নিন্দা কর্‌তে না, কেমন, এই বল্‌তে চাও তো?"

—"না, তা কেন? যদি জান্‌তুম যে, আমার নিন্দেটা আপনি যেচে নিজের গায়ে মেখে নেবেন, তাহ'লে অমন কথা আমি মুখেও আন্‌তুম না।"

—"কেন, আমিও তো পুরুষ, আমাকেও বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে সহজ না হ'তে পারে তো! কি ক'রে জান্‌লে, আমিও ব্যাধের মত ফাঁদ পাত্‌চি না?"

রাধারাণীর চোখদুটি জলে ভ'রে উঠ্‌ল। করুণস্বরে সে বল্‌লে, "আলোকবাবু, আপনাকে সন্দেহ কর্‌বার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়!"

—"না রাধারাণী, আমিও পুরুষ জাতিরই একজন, আমাকেও সন্দেহ কর্‌লে তোমার কোন দোষই হবে না। পুরুষের যে ইতিহাস আমি জেনেচি, তাতে নিজের ওপরেও আর আমার বিশ্বাস নেই।" তারপর

একটু থেকে বল্লে, "তোমার সেদিনকার কথাই ঠিক রাধারাণী! এই বাঙলা দেশে তোমারি মত শত শত নির্দ্দোষ নারী পুরুষের পাপের ভার মাথায় নিয়ে গম্ভীর [illegible] ডুবে আছে, তাদের কাতর হাহাকারে সারা আকাশ ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু দণ্ডধারী, বৃদ্ধ, স্থবির সমাজের কাণে গিয়ে তা পৌঁছোচ্ছে না!"

রাধারাণী অল্পদিনেই আলোককে চিনে নিয়েছিল, কারণ তার সরল প্রাণের স্বরূপ চিন্‌তে একটা শিশুরও দেরি লাগে না। যে তার বাইরেটা দেখেছে, সে তার ভিতরটাও দেখে ফেলেছে—তার দেহের আর মনের ফোটোগ্রাফ এক। কিন্তু আলোকের আজ্‌কের কথাগুলো এতক্ষণ রাধারাণীর মনে হচ্ছিল, কেমন যেন খাপ্‌ছাড়া—এ যেন তার চরিত্রের সঙ্গে বেশ মিশ্‌ খাচ্ছে না। তবে, তার শেষ কথাগুলো শুনে রাধারাণীর সব ধাঁধা মিটে গেল,—সে বুঝ্‌তে পার্‌লে, তার কথার আসল অর্থ কি, কোন্‌ দিক থেকে আঘাত পেয়ে তার স্বভাব-মিষ্ট কথা আজ এতটা তিক্ত হয়ে উঠেছে!

রাধারাণী আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লে, "কিন্তু আলোকবাবু, নারীর এই হাহাকার বন্ধ কর্‌বার কোন উপায় দেখ্‌তে পেলেন কি?"

আলোক নীরবে ঘরের ভিতরে দু-চার বার পায়চারি কর্‌লে, একবার জান্‌লার কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ফিরে রাধারাণীর মুখের পানে চেয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ, একটা উপায় ঠিক করেচি। আমি এই অভাগীদের জন্যে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করব, তোমার মত তাদেরও নরক থেকে উদ্ধার ক'রে এনে সেই আশ্রমে আশ্রয় দেব। অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত ক'রে সকলকে এমন সব কাজ শেখাব, যাতে আশ্রমে ব'সেই হাতের কাজের দ্বারা তারা নিজেদের জীবিকা-নির্ব্বাহ কর্‌তে পারে।"

রাধারাণী বল্‌লে, "কিন্তু এমন আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হ'লে যে অনেক টাকার দরকার!"

—"টাকা! টাকা যত লাগে আমি দেব।"

—"বুঝলুম। কিন্তু আপনার কাজে সমাজ খুসি হবে না,—এটা বেশ জেনে রাখ্‌বেন।"

অধীরভাবে কক্ষতলে পদাঘাত ক'রে, সবেগে মাথা নেড়ে আলোকনাথ ব'লে উঠ্‌ল, "আমি বিদ্রোহী!—মনুষ্য-ধর্ম্মের উপরে আমি এই পচা, ধসা, অসাড়, পুরাতন সমাজকে স্থান দেব না, দেব না, দেব না! তার জরাজীর্ণ হস্তকে মূর্খ ছাড়া আর কে ভয় কর্‌বে? আমি দুর্ব্বল নারী নই, আমি পুরুষ,—মুক্ত বিশ্বের উদার আলো-হাওয়া আমাকে শক্তিবান্‌ ক'রে তুলেচে, ঐ প্রাচীন সমাজের সঙ্গে আমি অনায়াসে যুঝ্‌তে পার্‌ব! বাঙ্‌লার চারিদিকে আজ পদদলিত মনুষ্যত্বের কান্না শুন্‌তে পাচ্ছি,—উচ্চ-জাতির লাথি খেয়ে নিম্নজাতি কাঁদ্‌চে, অন্তঃপুরের মূর্খতার অন্ধকারে বন্দী হয়ে বঙ্গ-নারী কাঁদ্‌চে, কু-সংস্কারের হাঁড়িকাঠে গলা পেতে বালিকা-বিধবা কাঁদ্‌চে, পুরুষের পাপ-বাসনার অত্যাচারে অকূলে ভেসে নিষ্পাপ পতিতারা কাঁদ্‌চে, ঋণের দায়ে পথের ভিখারী হয়ে মেয়ের বাপেরা কাঁদ্‌চে!—এই দেশব্যাপী কান্নায় যে-সমাজের ঘুম ভাঙে না, সে-সমাজ যে বেঁচে আছে, তারই বা প্রমাণ কি? কে বল্‌তে পারে, সমাজের এই নিদ্রা মহানিদ্রা কিনা?—মানুষের সমাজে মনুষ্যত্বের লক্ষণ থাকে—বেঁচে থাক্‌লে আজ সে সাড়া না দিয়ে পার্‌ত না!"

রাধারাণী শান্তস্বরে বল্‌লে, "আলোকবাবু, আপনি উত্তেজিত হয়েচেন, আগে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে সব দিক ভেবে দেখুন। আপনি বলচেন, টাকা খরচ কর্‌বেন, সমাজের ভয় কর্‌বেন না। বেশ, ভালো কথা। কিন্তু

যাদের নিয়ে আশ্রম গড়্‌বেন, তাদের উদ্ধার ক'রে আন্‌বেন কি উপায়ে? সেটা ভেবে দেখেচেন কি?"

—"ভেবে দেখেচি। আমি যাদের খুঁজ্‌চি, তাদের কোথায় পাব, আমার বন্ধু বিমল তার অনেক সন্ধান এনে দিয়েচে। বিমলেরই সাহায্যে আমি তাদের উদ্ধার ক'রে আন্‌ব। কিন্তু গোড়াতেই কাজটাকে মস্ত-বড় ক'রে তুল্‌তে চাই না, তাতে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আগে ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে কাজ সুরু কর্‌ব। যারা ভদ্রলোকের মেয়ে হয়েও, নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেকদিন এ পথে আছে, তাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ ছাড়া এখন আমরা আর বেশী কিছু করতে পার্‌ব না। কিন্তু যারা বাধ্য হয়ে সদ্য সদ্য নরকে এসে পড়েচে, নারী-জীবনের চরম দুর্ভাগ্যে এখনো যারা অভ্যস্ত হয়নি, দেহ-বিক্রয়ের অপমানের চেয়ে মৃত্যুকে এখনো যারা শ্রেয় ব'লে ভাবে, আপাতত তাদের নিয়েই আমি আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর্‌ব। অন্যদের কথা পরে ভাবা যাবে—নইলে সব দিক সাম্‌লানো শক্ত হয়ে উঠ্‌বে।"

—"আপনি ঠিক বলেচেন—নরক যাদের গ্রাস করেচে আগে তারা নয়—নরক যাদের গ্রাস কর্‌তে চায়, আগে তাদেরই দেখা দরকার।"

—"কিন্তু রাধারাণী, এ কাজে তুমি না থাক্‌লে আমি কিছুই কর্‌তে পার্‌ব না। বুঝতেই পারচ, আমার দ্বারা আগাগোড়া সব দেখা-শুনো সম্ভব হবে না। আশ্রমের বাইরে থেকে যা কর্‌বার, আমি অবশ্য প্রাণপণেই তা কর্‌ব। কিন্তু আশ্রমের ভিতরে আমি পুরুষের সম্পর্ক রাখ্‌তে রাজি নই,—সেখানে তোমাকেই কাজের ভার নিতে হবে।"

—"আলোকবাবু, এ কথা না বল্‌লেও চল্‌ত। কর্ত্রী কেন,—দাসীর মতই আমি আশ্রমের ভিতরকার সমস্ত কর্ত্তব্য-পালন কর্‌ব। জীবন্ত মরণ থেকে আপনি আমাকে টেনে এনেচেন,—আমাকে আপনার ক্রীতদাসী

ব'লে জান্‌বেন, আপনার ইচ্ছা আমি ইষ্টদেবতার আদেশের মত মাথা পেতে নেব,—এর চেয়ে আর বেশী কি আমি বল্‌বো?"

—"আর বেশী-কিছু বল্‌তে হবে না, ইতিমধ্যে যা ব'লে নিলে তা যথেষ্টরও বেশী হয়ে গেছে। বাড়ীতে আমার দাসীর অভাব নেই,—যদিও তারা ক্রীত নয়। তাদের দিয়েই আমার দিব্য চ'লে যাচ্ছে। সুতরাং এই বিশ শতাব্দীর পৃথিবীতে আমার আর ক্রীতদাসীর দরকার দেখচি না —কারণ আমি রুমের বাদ্‌শা নই। অতএব ভবিষ্যতে ও-লোভ দেখিয়ে আমাকে আর অপমান না কর্‌লেই আমি খুসি হব রাধারাণী!"

মুকুলমালা এতক্ষণ চুপ ক'রে মাদুরের উপরে ব'সে ব'সে এক মনে সব শুন্‌ছিল। তার ছোট্ট কপালখানির উপরে—চাঁদের পাশে রাহুর আভাসের মত—একটুখানি ঘোম্‌টা উঁকি মার্‌ছিল বটে, কিন্তু আলোকের শুভ্র, অকুণ্ঠ সরলতার কাছে তার বোবা লজ্জা যেন লজ্জা পেয়ে আপনিই এখন স'রে গেছে।

মুকুলমালা আজ্‌কের কথাবার্ত্তা শুনে বুঝ্‌লে, আলোক এখন এক গুরুতর কর্ত্তব্যের পাকে জড়িয়ে পড়্‌তে চলেছে। তার মনে বড় ভয় হোলো। সে ভাব্‌লে, এই নূতন কর্ত্তব্যের বোঝা ঘাড় পেতে নিলে আলোক আর তার কথা ভাব্‌বার অবসর মোটেই পাবে না। এখনো সে আশাকে ছাড়্‌তে পারেনি,—কেই-বা পারে? দুনিয়ার হাজার দুঃখ-ঝঞ্ঝাটের ঝটকায় মানুষের মন যখন ভেঙে-চুরে খান্‌-খান্‌ হয়ে যায়, একমাত্র আশাই তখন সোণার সূতোর মতন মনের সেই ভগ্নাংশগুলিকে একত্রে বেঁধে রাখে;—সে সূতো ছিঁড়ে দাও, অন্তিম দীর্ঘশ্বাসের ঝড়ে ভগ্ন-প্রাণ তখনি ধূলা হয়ে পঞ্চভূতে মিশিয়ে যাবে!

মুকুলমালা কাঁদো-কাঁদো স্বরে ব'লে উঠ্‌ল, "আলো-দাদা, তাহ'লে, আমার কি হবে?"

আলোকনাথ মমতায় কোমল স্বরে বল্লে, "বোন, তোমাকে তো আমি ভুলিনি!"

—"আমাকে তুমি ভোলোনি, তা আমি জানি দাদা, কিন্তু আমাকে কি চিরকাল এইখানেই পড়ে থাকতে হবে?"

—"আমি রোজ তোমার স্বামীর খোঁজ নিচ্ছি, পুলিসে খবর দিয়েচি, খবরের কাগজে পুরস্কার ঘোষণা করেচি, কিন্তু তাঁর কোন খোঁজ তো পাওয়া গেল না!"

রাধারাণী বল্লে, "আর খোঁজ পাওয়া গেলেও যে মুকুলের বিশেষ কোন উপকার হবে, আমার তো তা মনে হয় না।"

মুকুলমালা বল্লে, "কেন দিদি?"

রাধারাণী বল্লে, "বেশী আশা করিস্‌নে ভাই, তাহ'লে শেষটা আশা-ভঙ্গের দুঃখে হয়তো পাগল হয়ে যাবি! আমার তো মনে হয়, তোর স্বামী আর তোকে গ্রহণ কর্‌বেন না!"

মুকুলমালা প্রবল আবেগে বল্লে, "না, না, না দিদি! তুমি তাঁকে চেন না, এত নিষ্ঠুর তিনি নন!"

—"এখানে নিষ্ঠুরতার কথা তো হচ্চে না, তোমার স্বামী হয় তো সমাজের অনুগত, সমাজ তাঁকে দয়াপ্রকাশ কর্‌তে দেবে না।"

আলোকনাথ বল্লে, "ও-সব ভুয়ো কথা, বাজে ওজর! মন যার ক্রূর নয়, সত্যিই যে ভালোবাসে, সমাজের মুখে চেয়ে কখনো সে কাজ করে না! তা যদি করে, তবে সে নিষ্ঠুর নয় তো কি? এমন অবস্থায় পড়্‌লে আমি কখনো স্ত্রীকে ছেড়ে ডুব মেরে থাক্‌তুম না। মুকুলের স্বামী যে আজ অদৃশ্য হয়ে আছেন, এটা তাঁর নিষ্ঠুরতারই প্রমাণ, এতে তাঁর মনুষ্যত্বেও আমার সন্দেহ হচ্ছে :—"

মুকুলমালা বসেছিল, আচম্বিতে উঠে দাঁড়াল। ঝাঁঝালো গলায় বললে, "থামুন!"

তার গলার আওয়াজে চম্‌কে আলোক অবাক্ হয়ে মুকুলমালার দিকে তাকিয়ে রইল!

—"আমার চেয়ে তাঁকে আপনি বেশী চেনেন না—তাঁর নিন্দা কর্‌বার আপনার কোনই অধিকার নেই! আমার স্বামী নিষ্ঠুরও নন, অমানুষও নন—তিনি দেবতা! তিনি আমাকে খুঁজতে বেরিয়েচেন, আমাকে না পেলে তিনি বাড়ীতে ফির্‌বেন না!—আপনারা কেন আমার স্বামীকে নিন্দা কর্‌চেন, কেন আমাকে এমন ক'রে লুকিয়ে রেখেচেন?"

আলোকনাথ আহত স্বরে বল্‌লে, "যদি না বুঝে তোমার মনে ব্যথা দিয়ে থাকি, তবে তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু তোমাকে আমরা লুকিয়ে রাখিনি, আমার ওপরে এমন সন্দেহ করাও তোমার অন্যায়।" এই ব'লে সে আর উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাধারাণী দুঃখিতভাবে বল্‌লে, "যিনি তোমাকে সর্ব্বনাশ থেকে বাঁচিয়েচেন, তাঁকে তুমি এতবড় অপবাদটা দিয়ে ভালো কর্‌লে না বোন্! ছিঃ, উনি তোমাকে লুকিয়ে রেখেচেন? না, তুমিই ওঁর ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েচ? উনি যদি ঘাড় থেকে নামিয়ে দেন, তাহ'লে তোমার কি দশা হবে বল দেখি!"

মুকুলমালা বুঝ্‌লে, মনের ঝোঁকে সে কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলেছে! রাধারাণীর কাঁদের উপরে মাথা রেখে ছল-ছল চোখে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বল্‌লে, "তাঁর নিন্দে কর্‌লে আমি সে সহ্য কর্‌তে পারি না ভাই!"

এগারো

কল্‌কাতার প্রান্তে আলোকের প্রকাণ্ড একখানা বাগানওয়ালা অট্টালিকা ছিল। সেইখানেই আশ্রম-প্রতিষ্ঠা হোলো। তার নাম হোলো, "দেবীর আশ্রম"। বন্দোবস্ত কর্‌বার জন্যে প্রথম কিছুদিন সেই বাগানের ভিতরেই আর একখানি ছোট বাড়ীতে আলোক বাস কর্‌তে লাগ্‌ল।

আলোকের বন্ধু বিমল গুপ্তচর লাগিয়ে কল্‌কাতার দুর্নীতির নরকগুলি তোল্‌পাড় ক'রে তুল্‌লে। মাস-খানেকের মধ্যেই "দেবীর আশ্রমে" এমন পঁচিশটি নারী আশ্রয় লাভ কর্‌লে, যারা সদ্য সদ্য সয়তানের গ্রাসে গিয়ে পড়েছিল। অনেক পরখ ক'রে, খোঁজখবর নিয়ে তবেই তাদের এখানে আনা হয়েছে। তাদের চোখ-মুখ, হাব-ভাব, ধরণ-ধারণ দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে বিলম্ব হয় না যে, দুর্নীতির "ট্রেড্‌-মার্ক" এদের সতীত্ব-গৌরবকে এখনো কিছুমাত্র কলঙ্কিত কর্‌তে পারে-নি এবং "পঞ্চকন্যা"র নাম যদি শ্রদ্ধা সহকারে প্রাতঃস্মরণীয় হয়, তবে বাঙ্‌লায় মানুষের সমাজ তাদেরও আশ্রয় দিতে বাধ্য।

পর-পুরুষের আলয়ে বহুকাল বাস কর্‌বার এবং রাবণের স্পর্শের পর সীতা যখন রাণী হয়ে অযোধ্যার সিংহাসনে এসে বস্‌লেন, দুষ্ট, মূর্খ সমাজ তখনো ক্ষমা করেনি;—সে অন্যায় অত্যাচারের বুক-ভাঙা কাহিনী বাল্মীকি তাঁর অমর মহাকাব্যে জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণনা করেছেন এবং যুগ-যুগান্তর পরে আজও ত্রেতার সেই লাঞ্ছিতা নারীত্বের প্রতি সকরুণ সহমর্ম্মিতায় নিখিল মানুষের চিত্ত নীরব হা-হায় ভ'রে ওঠে, চোখের জল পুঁথির প্রতি ছত্রটি সিক্ত ক'রে তোলে।

কিন্তু এতকাল পরেও ভারতের রক্ষণশীল বৃদ্ধ-সমাজ একটুও বদ্‌লে যায়নি—কাণে তূলো গুঁজে, চোখে ঠুলি এঁটে সে বসে আছে অটল স্থবিরের মত ; এবং বিধাতার বিধানের মত সে একবার যা লিখেছে, আর তা সংশোধন কর্‌তে রাজি নয়। একালে আর বাল্মীকিও নেই, নির্ব্বাসিতা সতীর দুঃখে তাই কেউ আর তেমন ক'রে কাঁদেও না। তা যদি কাঁদ্‌ত, তবে আজ রামায়ণের মতন আরো অনেক মহাকাব্য দেখ্‌তে পেতুম।

আদি-যুগের সেই পশুত্বের, সেই বর্ব্বরতার পঙ্কিল স্রোত খরতর, গভীরতর হয়ে অদ্যাবধি একটানা বয়ে চলেছে—তার উপরে কেউ সেতু-বন্ধনের চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি!—"মানুষ, একবার পায়ের তলায় চেয়ে দেখ, কত সীতার দেহ আজও প্রতিদিন পাঁকের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে!"—মনুষ্যত্বের এ আহ্বান বৃথা, কেউ তাতে সাড়া দিলে না।

কিন্তু এ ডাক আলোকের বুকে বেজেছে। সে জলের মত অর্থব্যয় কর্‌তে লাগল, তার মুখে আর অন্য কথা নেই, তার মনে আর অন্য চিন্তা নেই! সে সকালে উঠে কাজে লাগে, আর গভীর রাত্রির আগে কাজে বিরাম দেয় না।

যে পঁচিশটি নারীকে নিয়ে আলোকনাথ কাজ সুরু কর্‌লে, তাদের কেউ সধবা, কেউ বিধবা এবং অধিকাংশই পল্লীগ্রাম থেকে নরক-কুণ্ডে এসে পড়েছিল। তাদের কারুর উপরে দস্যুর মত হঠাৎ এসে পুরুষ এক-মুহূর্ত্তে কলঙ্কের ছাপ্‌ মেরে দিয়ে গেছে, ছলে-কৌশলে কারুকে বা দুরাত্মারা সীতার মতই হরণ ক'রে এনেছে! আলোক পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লে, তাদের মন এখনো কাঁচা সোণার মতই খাঁটি আছে, তাদের মা-বোন ব'লে ডাক্‌তে কোথাও এতটুকু বাধে না। কিন্তু সমাজ এদেরই 'পতিতা' ব'লে ডেকে নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বের অপমান করেছে! অথচ যে-সব ব্যভিচারী নর-

পশু এই বেচারীদের উচ্চ বেদী থেকে জোর ক'রে টেনে নামিয়েছে, আদুরে পোষ্যপুত্রের মত এখনো তারা সমাজের কোলের ভিতরে নিরাপদে নূতন নূতন শিকারের সন্ধানে ওৎ পেতে ব'সে আছে! সমাজের কাজীর বিচারে খড়্গাঘাত চলছে নিহত আত্মার উপরে, কিন্তু মুক্তি পাচ্ছে সেই সব সয়তান,—আত্মার যারা হত্যাকারী।

আশ্রমের ভিতরে থেকে সকলেই যাতে নানান রকম শিল্পকর্ম্ম শিখ্‌তে পারে, আলোকনাথ তারও ব্যবস্থা ক'রে দিলে। ছবি-আঁকা, সূচীকর্ম্ম, মোজা-গেঞ্জি ও পশমী জিনিস বোনা, মাটির হরেক রকম খেলনা গড়া, চর্‌কা ঘোরানো ও হাতে-চলা তাঁত চালানো প্রভৃতি শেখাবার জন্যে চারিদিক থেকে মাহিনা-করা শিক্ষয়িত্রী আনা হোলো। পরে নারীদের হাতের কাজ বাজারে বিক্রী কর্‌বার বন্দোবস্তও হবে। যারা নিরক্ষর, তাদের লেখাপড়াও শেখানো হ'তে লাগল্‌। আশ্রমের মধ্যে একটি পুস্তকাগারেরও অভাব রইল না। অট্টালিকার চারিপাশে যে বিস্তৃত বাগান ছিল, সেখানে খোলা হাওয়ায় বিচরণ-ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেওয়া হোলো। মোট কথা, যাতে আশ্রম-বাসিনীরা স্বাবলম্বী হ'তে পারে, নানা কাজে নিযুক্ত থেকে নিজেদের দুর্ভাগ্যের যাতনা ভুলে থাক্‌তে পারে, যাতে তাদের জ্ঞান ও মনের বিস্তার বাড়ে, আলোকনাথ সে পক্ষেও কিছুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি কর্‌লে না। এমন-কি, বায়স্কোপের যন্ত্র ও ফনোগ্রাফ পর্য্যন্ত কিনে আশ্রমের ভিতরে এনে রাখা হোলো। তা ছাড়া মাঝে মাঝে সকলকে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা ও "বোটানিক্যাল গার্ডেনে"ও বেড়িয়ে আন্‌বার নিয়ম করা হোলো। আলোকনাথ অনেক ভেবে-চিন্তে আশ্রমের কর্ত্তব্যের এই খসড়া তৈরি ক'রে ছিল।

আশ্রমের কর্ত্রীর কাজে রইল রাধারাণী। তার কর্ম্মোৎসাহ দেখে আলোকনাথ বুঝ্‌লে, আশ্রম-প্রতিষ্ঠা কিছুতেই ব্যর্থ হবে না। রাধারাণী

নিজে যে কেবল খুব ভালো লেখাপড়া জান্‌ত, তা নয়; নানাবিধ শিল্প-কার্য্যেও তার অপূর্ব্ব নিপুণতা দেখে আলোকনাথ আশ্চর্য্য হয়ে গেল! এই-সব গুণ আজ'সে গভীর আগ্রহে কাজে খাটাতে লাগ্‌ল। কেবল কাজে নয়, তার মিষ্ট কথা ও মধুর সান্ত্বনা আশ্রমের নারীগুলির হৃদয়-ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপের মত কাজ কর্‌লে, তার হাসিমাখা আশার বাণীতে সকলের ভাঙা বুক আবার যেন যোড়া লাগল, আবার যেন মৃত প্রাণের নব জন্ম হোলো। রাধারাণী তাদের বুঝিয়ে দিলে যে, 'পৃথিবীতে সুদিনে-দুর্দ্দিনে কোন-কালেই মানুষের জীবন বিফল নয়, মানুষের সার্থকতা আছেই! সুখে খুসি হোয়ো, কিন্তু দুঃখে হতাশ হোয়ো না—কারণ মনুষ্যত্বের সব-চেয়ে বড় পরীক্ষা দুঃখের ভিতর দিয়েই। দুঃখ শাসন কর্‌তে পারে অমানুষকেই, কিন্তু আসল যে মানুষ, দুঃখ তার পায়ের তলায় প'ড়ে থাকে পোষা-কুকুরের মত। সমাজ অবিচার ক'রে 'অমানুষ' অপবাদ দিয়ে তোমাদের উপরে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়েছে ব'লে তোমরা কেন হতাশ হবে, কেন অমানুষ হবে? গোলাপকে ফুলদানীতেই রাখো, আর গোবর-গাদাতেই ফেলে দাও, সে যে-গোলাপ সেই গোলাপই থাকে। বলবান ডাকাত এসে আচম্বিতে জোর ক'রে তোমাদের দেহের উপরে অত্যাচার করেছে বটে, কিন্তু কি কর্‌বে, সবলের অত্যাচারে বাধা দেবার শক্তি তো কারুর নেই! তবে, দেহের ভিতরে আছে যে গোপন মন, জোর ক'রে যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না, সেই মনকে তোমরা সাবধানে রক্ষা কোরো। এই মন যদি খাঁটি থাকে, তবে কলঙ্কিনী নাম কিনলেও, আসলে তোমরা কেউই সীতা-সাবিত্রীর চেয়ে কম সতী নও!'

রাধারাণীর দেখা-দেখি মুকুলমালাও আগ্রহের সঙ্গে কাজে যোগ দিলে। মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় প্রথম তার মনে একটা সঙ্কোচের

আভাস জেগেছিল। এরা কোথাকার কে, এদের দেহ অপবিত্র হয়েছে, পরপুরুষকে হয়ত এরা দেহ-বিক্রী করেছে, স্বেচ্ছায়। তবে এদের সংসর্গে থেকে কেন সে নিজের দেহকে কলঙ্কিত করবে?

একদিন এই ধরণের কি-একটা কথা কইতেই, রাধারাণী তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধ'রে বললে, "চুপ্, চুপ্, অমন কথা মুখেও আনতে নেই!"

—"কেন দিদি?"

—"ওদের তুমি যদি অসতী ভাবো, তবে তুমি কি?"

চোখে বিদ্যুতের শিখা জ্বালিয়ে, মাথা তুলে মুকুলমালা তীক্ষ্ণস্বরে বললে, "দিদি, তুমি এই কথা বললে! আমি অসতী!"

রাধারাণী মৃদু হেসে বললে, "বালাই, আমার কি সাধ্যি, তোমাকে অত-বড় কথা বলি? সে মুখ আমার নেইও, থাকলেও বলতুম না। কিন্তু লোকে তোমাকে কি বলে বোন্?"

তিক্ত কণ্ঠে মুকুলমালা বললে, "লোকে যদি দিনকে রাত বলে! আমি তো অসতী নই, আর তুমি তো তা জানো!"

রাধারাণী বললে, "জানি বৈ কি বোন্, খুবই জানি। কিন্তু ওদের বেলায় তুমি নিজের কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? সেদিন যদি আলোকবাবু দৈবগতিকে না গিয়ে পড়তেন, তাহ'লে তোমারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা তোমার ওপরে অত্যাচার করত তো? গুণ্ডা যদি তোমার গলা টিপে হার কেড়ে নিয়ে যায়, তবে তুমি দোষী, না গুণ্ডা দোষী?"

মুকুলমালা লজ্জিত হয়ে বললে, "দিদি, আমার দোষ হয়েচে, আমাকে মাপ কর।"

তারপর থেকে মুকুলমালাও একমনে, সমান আগ্রহের সঙ্গে আশ্রমের কাজে রাধারাণীর সাহায্য করতে লাগল। তাদের দুজনের যত্নে-চেষ্টায়-শ্রমে আশ্রমের সর্ব্বত্রই একটি স্নিগ্ধ লক্ষ্মী-শ্রী ফুটে উঠল।

আলোকনাথ একদিন রাধারাণীকে ডেকে বল্‌লে, "দেখ রাধারাণী, এখন আর একদিকে আমাদের মন দিতে হবে।"

—"কি, বলুন।"

—"আশ্রমের মেয়েরা যাতে ব্যায়ামের গুণ বোঝে, তুমি সেই চেষ্টা কর।"

পরম বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে রাধারাণী বল্‌লে, "ব্যায়াম! বলেন কি! বাঙালীর মেয়ে কুস্তি লড়্‌বে, লাঠি ঘোরাবে, ডন-বৈঠক দেবে, ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজ্‌বে! এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও তো কখনো শুনিনি!"

মুকুলমালাও সেখানে ছিল, সে তো মুখে কাপড় চাপা দিয়েও হাসির ধাক্কা সাম্‌লাতে পারলে না।

আলোকনাথ কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়েই বল্‌লে "এ-কথাটা তোমাদের কাছে নতুন ব'লে মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু য়ুরোপে-আমেরিকায় এ-কথা সবাই জানে আর সবাই মানে! মেয়েরা সেখানে রোজ রীতিমত ব্যায়াম করে, তাই তাদের দেহের গড়ন আর স্বাস্থ্য এত ভালো হয় যে, তা দেখ্‌লে এদেশের অনেক বড় বড় রূপসীরও রূপের দেমাক ভেঙে যাবে। এখানে সঙ্কীর্ণ অন্তঃপুরে বন্ধ থেকে থেকে মেয়েদের অবস্থা হয়, আড়ষ্ট খাঁচার-পাখীর মত; বিলাতে যে-সব মেয়ে ব্যায়াম করেন না, তাঁদেরও তবু খোলা আলো-বাতাসে স্বাধীন গতিবিধির অবকাশ আছে; কিন্তু অঙ্গ-চালনার সেটুকু সুযোগ থেকেও বাঙালী মেয়েরা একেবারে বঞ্চিত। এইজন্যেই আমার মনে হয়, বিলাতের চেয়ে বাঙ্‌লাদেশেই মহিলা-সমাজে ব্যায়ামের উপযোগিতা বেশী। "কুড়ি হলেই বুড়ী" ব'লে বঙ্গবধূর যে অপবাদ আছে, তার আসল কারণ হচ্ছে, এই ব্যায়ামের অভাব। কিন্তু বিলাতের মেয়েদের দেখ, পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁদের

অনেকেরই দেহ থেকে রূপের ফুল ঝ'রে পড়ে না, যৌবনের জোর ক'মে যায় না!"

মুকুলমালা বললে, "কিন্তু আলো-দাদা, অন্তঃপুরের আমরাও যদি পালোয়ানীর চাল চালি, লাঠি ঘোরাতে সুরু করি, তাহ'লে তোমাদের পুরুষজাতের অবস্থা তো বড় সুবিধের হবে ব'লে মনে হচ্চে না!"

আলোকনাথ বললে, "তা যদি পারতে বোন, তাহ'লে আজ তোমাদের এ অবস্থা হোতো না। য়ুরোপের—বিশেষ ক'রে আমেরিকার অনেক মেয়ে এমন সবলা, আর পালোয়ানীর এত প্যাঁচ জানে যে, পথে-ঘাটে তাদের দেখলে বেল্লিক পুরুষরা তফাত থেকেই নমস্কার ক'রে মানে মানে স'রে পড়ে। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। আসল কথা এই যে, রূপ হচ্ছে মানুষের প্রতি ভগবানের সেরা দান। রূপ হচ্চে পূজার জিনিস,—কারণ নিখুঁৎ রূপ আনন্দ দেয়। সে আনন্দ নির্দ্দোষ আর পবিত্র। ব্যায়ামে দেহের স্বাস্থ্য আর কান্তি দুইই বেড়ে ওঠে। একে অবহেলা করা পাপ, আর সেই পাপ বাঙ্লার নর-নারী দুজনেই করচে।"

রাধারাণী বললে, "বাঙালীর মেয়ের যেটুকু রূপ আছে, তাইতেই রক্ষে নেই, তারই চোটে পাগল হয়ে এখানকার পুরুষগুলি হামেসাই যে-রকম অদ্ভুত রূপ-পূজা সুরু করেচেন, তা ভাবলেও বুক শিউরে ওঠে। এর ওপরে আরো রূপ বাড়াবার চেষ্টা করলে আপনাদের পুরুষজাতির যতই আনন্দ হোক্, আমাদের ভয় আর বিপদও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠবে যে! ছাই রূপ! এদেশে আমরা যেন হাড়-কুৎসিত হয়ে জন্মাই।"

আলোকনাথ বললে, "অন্য কারুর কাছে তোমার এ যুক্তিটা হাস্যকর হোতো। তবে তোমরা যে অবস্থায় পড়েচ, তাতে তোমাদের মুখে এ যুক্তিটা মানিয়ে গেল একরকম, আর এমন কথা বলবার অধিকারও

তোমার আছে বটে। কিন্তু ঘরে অর্থ বাড়্‌লে চোরের ভয়ও বাড়ে, তাই ব'লে অর্থ-সঞ্চয়ে বিমুখ হ'লে তো চল্‌বে না!"

মুকুলমালা বল্‌লে, "আলো-দাদা, আশ্রমের মেয়েদের রূপ বাড়াবার চেষ্টা ক'রে লাভ কি? ও-বেচারীদের রূপ যে একেবারে ব্যর্থ, এ-জীবনে আর তো তার কোন সার্থকতা নেই!"

আলোকনাথ বল্‌লে, "কিন্তু স্বাস্থ্যের ওপরে এখনো তো ওদের ষোল-আনাই দাবি আছে! মানুষের জীবনে সকল সময়েই স্বাস্থ্যের সার্থকতা থাকে, নইলে বেঁচে থাকার কোনই অর্থ পাওয়া যাবে না। আত্মহত্যা করা যদি মহাপাপ হয়, তবে স্বাস্থ্যে অবহেলা করাও কম পাপ নয়—কারণ কু-স্বাস্থ্যের ফলে ব্যাধি, আর ব্যাধির ফলে মরণ! এই ব্যাধির কবল থেকে ব্যায়াম আমাদের দেহকে সর্ব্বদাই রক্ষা করে।"

রাধারাণী বল্‌লে, "আপনার মত্ মেনে নিলুম। কিন্তু আশ্রমের মেয়েরা ব্যায়ামের প্রস্তাবে নিশ্চই হতভম্ব হয়ে যাবে!"

মুকুলমালা বল্‌লে, "খালি হতভম্ব নয়, এ কথায় তারা দস্তুরমতন নারাজ হবে।"

আলোকনাথ বল্‌লে, "তাদের রাজি করাবার ভার তোমাদের ওপরে রইল। একেবারে ব্যায়াম কর্‌তে বল্‌লেই বিস্ময়ে তারা চম্‌কে যাবে সুতরাং সে চেষ্টা কোরোনা। প্রথম প্রথম প্রসঙ্গক্রমে তাদের কাছে ব্যায়ামের কথা তুল্‌বে, ব্যায়ামের উপকারিতা বোঝাবে। তোমাদের হাতে আমি আজ্‌কেই ব্যায়ামের অনেক বই দেবো, তা পড়্‌লেই কি বলা উচিত সেটা তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌বে। শুনে শুনে যখন তাদের কান অভ্যস্ত হয়ে যাবে, ব্যায়ামের মর্ম্ম তারা তলিয়ে বুঝ্‌বে, তখন ও-প্রস্তাবে তারা আর হতভম্ব হবে না, আর অল্পে অল্পে তাদের ব্যায়ামে প্রবৃত্ত করাতেও তোমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না।"

রাধারাণী বল্‌লে, "কিন্তু ডাম্বেল-মুগুর ভেঁজে মেয়েগুলির চেহারা ষটা গুণ্ডার মত চোয়াড়ে হয়ে যাবে না তো।"

মুকুলমালা মেয়েগুলির ভবিষ্য চেহারা একবার কল্পনা ক'রে নিয়েই বল্‌লে, "মাগো! সে কি বেয়াড়া দেখ্‌তে হবে গো!"—এই ব'লেই ফের হাসি সুরু ক'রে দিলে!

আলোকনাথ কিন্তু গম্ভীর মুখেই বল্‌লে, "ওটিও একটি মস্ত ভুল। ঠিক নিয়মমত ব্যায়াম কর্‌লে, মেয়ে-পুরুষ কারুর চেহারাই চোয়াড়ে হয় না। আর পুরুষরা পালোয়ান হবার জন্যে যে-সব ব্যায়াম করে, তোমাদের তাও তো কর্‌তে বল্‌চি না। তোমাদের উপযোগী হাল্‌কা মেয়েলী ব্যায়ামও অনেক রকমের আছে। বই পড়্‌লেই তোমরা তা বুঝ্‌তে পার্‌বে। এই ধর, যেমন সাঁতার। মেয়েদের—পুরুষদেরও—পক্ষে সাঁতার একটা ভারি উপকারী ব্যায়াম। এম্‌নি আরো ঢের রকমের ব্যায়াম অনায়াসে তোমরা কর্‌তে পার্‌বে।"—এই ব'লে আলোকনাথ চ'লে গেল।

মুকুলমালার হাসি তখন উচ্ছ্বসিত আবেগে বেরিয়ে এল, হাসির চোটে তার চোখ জলে ভ'রে উঠ্‌ল।

রাধারাণী তার হাত ধ'রে এক টান্ মেরে বল্‌লে, "নে, তোর হাসি থামা ছুঁড়ী! দিন-কে-দিন তুই ভারি বাচাল হয়ে উঠ্‌চিস্!"

হাস্‌তে হাস্‌তে মুকুলমালা বল্‌লে, "দিদি, কুস্তি লড়ে আমরা এবার মেয়ে-পালোয়ান হব! তারপর আশ্রমের দরজায় ব'সে, [illegible] হয়ে লাঠি ঘাড়ে ক'রে কড়া পাহারা দেব! আশ্রমের আনাচে-কানাচে পুরুষের টিকির এতটুকু ডগা কি গোঁফ-দাড়ির একটুখানি টুক্‌রো অম্‌নি দেখা অম্‌নি "কোন্ হ্যায়রে" ব'লে তাল ঠুকে লাঠি ঘুরিয়ে বিষম এক তাড়া—বুঝেচ? এ অঞ্চলে মদ্দা মাছিটিকে পর্য্যন্ত ভোঁ ভোঁ কর্‌তে দেব না!"

মুকুলমালার গালে একটা ঠোনা মেরে রাধারাণী বললে, "থাম্ লো থাম্! তুইও আর জ্বালাস্ নে! এত দুঃখেও হাসি আসে? ভ্যালা মেয়ে যাহোক্!"

আমোদের মাঝখানে হঠাৎ এই হত ভাগোর ইঙ্গিত পেয়ে মুকুলের মুখে অন্ধকারের ছায়া ঘনিয়ে এল। বিমর্ষ হাসি হেসে, ছল-ছল চোখে মুকুল বল্লে, "হাসিই যে-দুঃখের শেষ-সম্বল দিদি! হাসির অভিনয়ে দুঃখী যে বড় দুঃসময়েও শান্তি পায়—নইলে তো সে বাঁচ্তে পার্ত না! আর কেঁদে কেঁদে সব কান্না যে আমার ফুরিয়ে গেছে, তাই এখন হেসে হেসেই কান্নার অভাব আমি মিটিয়ে নিচ্চি!"—বল্তে বল্তে সে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল—সজল একখানি বিষাদ-প্রতিমার মত!

রাধারাণী উদাস চোখে তার পানে তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

বারো

অল্পদিন যেতে না যেতেই বাঙ্‌লা সংবাদপত্রের সম্পাদকরা "দেবীর আশ্রমে"র বিরুদ্ধে তুমুল কোলাহল তুল্‌লেন—সে কোলাহল এমন গগনভেদী যে, পল্লীগ্রামের শৃগাল-সভাও তা শুন্‌লে স্তব্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য !

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের কোন মুখপত্র লিখ্‌লেন :—

"ঘোর কলি উপস্থিত ! হায়, হায়, ধর্ম্ম গেল—কর্ম্ম গেল,—নব্য বাবুদের নর্ম্ম-লীলায় মর্ম্ম ছিঁড়িল,—অস্থিচর্ম্ম ভাজা ভাজা হইল, ললাটে ঘর্ম্ম ছুটিল,—সমাজের বর্ম্ম টুটিল,—নূতনের দ্রংষ্টাঘাতে পুরাতন হর্ম্ম্য হুড়মুড়্ করিয়া ধ্বসিয়া পড়িল ! মা জগদম্বে ! একি করিলে মা ! হায় হায়, সব যায়—সব যায়—বড় দুঃখেই কবি গাহিয়াছেন,—"প'ড়ে এ কলির ফেরে সবই যেরে ভেঙে-চুরে যায় !" বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইলাম, আলোকনাথ রায় নামক এক কল্যকার যোগী বারবনিতাগণকে সমাজের ভিতরে আনয়ন-পূর্ব্বক স্থানপ্রদানের নিমিত্ত এক আশ্রম সংগঠন করিয়াছে। শুনিয়া অবধি আমাদের মস্তক স্থির হইতেছে না,—হস্ত সরিতেছে না,—চক্ষে পলক পড়িতেছে না,—ওষ্ঠ নড়িতেছে না,—ঘাড় বাঁকিতেছে না,—বক্ষ দুপ্ দুপ্ শব্দ করিতেছে না, উদরে ক্ষুধার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না (পড়্‌তে পড়্‌তে সম্পাদকের এই অভাবনীয় অবস্থাটা কল্পনায় দেখে নিয়ে আলোকের প্রাণ শিউরে উঠ্‌ল কিনা, জানিনা !) —কেবলই চিন্তা করিতেছি, হায় জগদম্বে, এ কি সর্ব্বনাশ করিলি মা ! এই কি তোমার মনে ছিল মা ? অবশেষে ইহাও দেখিতে-শুনিতে হইল ? —কিন্তু এই হিন্দু-কুলাঙ্গারকে ইহাও বলিয়া রাখিতেছি—অরে রে পাষণ্ড-

বংশাবতংস আমাদের এই সনাতন-সমাজ-মাতঙ্গকে মারিবার নিমিত্ত তোর ন্যায় বহু বহু পতঙ্গ ইতঃপূর্ব্বেই বহুচেষ্টাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ বিফল-প্রযত্ন হইয়াছে, করুণাময়ী মা জগদম্বার কৃপায় কেহই সনাতন ও পবিত্র হিন্দু-সমাজের দেহ হইতে একটিমাত্র লোম উৎপাটনেও সমর্থ হয় নাই (সনাতন ও পবিত্র হিন্দুসমাজের গায়ে যে পশুর মত লোম থাক্‌তে পারে, এ-কথা আলোকনাথ এই প্রথম শুন্‌লে !), অতএব শান্ত হ' রে বোকারাম ! ক্ষান্ত হ' ! মিনতি করিয়া কহিতেছি, ক্ষান্ত হ'—ক্ষান্ত হ', এ হেন প্রাণান্তকর কর্ম্ম করিলে অচিরেই কৃতান্ত-সদনে প্রস্থান করিবি—তাহা হইলে কোনক্রমেই আর প্রাণে বাঁচিবি না ! হে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ ! মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক দেব-দেবীর নাম স্মরণ করতঃ এই দুরাচার নব্য কালাপাহাড়ের পাপ-প্রয়াসের প্রতিরোধ করিতে, উঠিয়া-পড়িয়া কোমর বাঁধিয়া মালকোচা মারিয়া লাগিয়া যাও ! নহিলে ধর্ম্ম গেল—কর্ম্মও রহিল কৈ ? হায় হায় হায়—গেল, গেল, সনাতন হিন্দুসমাজ রসাতলে গেল—হয়ত এতক্ষণে গিয়াছে ! আবার বলি, হে মা জগদম্বে ! এ কি সর্ব্বনাশ করিলে মা, তুমি ছাড়া আমাদের যে আর কেহই নাই মা—"

আলোকনাথ এ লেখনীর প্রলাপ আর সহ্য কর্‌তে পার্‌লে না, সবটা পড়্‌বার আগেই কাগজখানা ঘরের এককোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হো হো ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌ল !

মুকুলমালা আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "আলো-দাদা, তুমি যে হাসচ ? তোমার রাগ হচ্চে না ? ভালো ক'রে সবটা প'ড়ে দেখ, তোমাকে আরো কত গালাগাল দিয়েচে !"

আলোকনাথ কোনরকমে হাসি থামিয়ে বল্‌লে, "বোন, পাগলের কথায় রাগ কর্‌লে পাপ হয় ! যে লোক এমন ভাষায় লিখে সেই লেখা আবার ছাপাতে পারে, তার নির্লজ্জ সাহসকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি !"

রাধারাণী বল্লে, "আমার তো প'ড়ে মনে হোলো লেখক সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে আর করুণাময়ী জগদম্বাকে মস্ত-বড় একটা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেচেন। জানিনা, দেশে মা জগদম্বার এমন ভক্ত আরো কতগুলি আছে!"

আলোকনাথ বল্লে, "লাখ লাখ;—পালে পালে—কাতারে কাতারে—গুণে ওঠা অসম্ভব! এরা সবাই কূপমণ্ডুক। সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলেও এরা ফের কূপে ফিরে আস্‌বার জন্যে হাহাকার ক'রে মর্‌বে!"

মুকুলমালা বল্লে, "ওঃ তাহ'লে এরা খুব স্বদেশভক্ত তো! সমুদ্র ছেড়ে কূপে থাক্‌তে এত ভালবাসে।"

—"তার জন্যে নয় মুকুল! সমুদ্রের বিপুলতার মাঝে গিয়ে পড়্‌লে এরা স্বচক্ষে নিজেদের ক্ষুদ্রতা দেখে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। তার চেয়ে কূপের সংকীর্ণতাই এরা ভালো মনে করে, কারণ সেখানে এদের আত্মম্ভরিতায় কোন ঘা লাগে না!"

আর একখানি খবরের কাগজ টেনে নিয়ে, আলোকনাথ তার সম্পাদকীয় টিপ্পনীতে এই কথাগুলি পড়্‌লে;—

"শুনিলাম, আলোকনাথ রায় বাবাজী কলিকাতার সীমান্তে (সহরের মধ্যে নয়—কারণ চক্ষুলজ্জা) একটি 'বারনারী-ভাণ্ডার' খুলিয়াছে। বাবাজীর বাপের দৌলত আছে, কাজেই খেয়ালেরও অন্ত নেই। সহরের সেরা সেরা মালগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া লুটিয়া আনিয়া সেখানেই গুদামজাত করা হইবে। রিরংসার মজাটুকু জমিবে মন্দ নয়। বাবাজীর খেয়ালের মৌলিকতা আছে বটে,—বাহাদুর আলোকনাথ, জীতা রহো বেটা!

আরো শুনিলাম, বারান্দাবিলাসিনীরা সেখানে মল্ল-রঙ্গিনী হইয়া কুস্তির

প্যাচ, লাঠির কসরৎ আর জিম্‌নাষ্টিকের মেহনৎ লইয়া মাতিয়া থাকিবেন। আসল ব্যাপারটা কিছু বুঝিলে কি? আলোকনাথ সেয়ানা ছেলে, রূপের নেশায় অরুচি ধরিয়া গেলে বাবাজী রঙ্গিনীদের লইয়া জাঁকালো সার্কাস খুলিবে, কামের বুভুক্ষায় যে টাকাটা খরচ করিবে, পরে সার্কাসে টিকিট বেচিয়া সেই টাকা তুলিয়া লইবে—ঘরের কড়ি ঘরে আসিবে—সাপও মরিবে লাঠিও ভাঙিবে না—রথও দেখিবে কলা বেচিতেও ছাড়িবে না। তোফা! সাবাস!—লাম্পট্যে এমন ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয় মাড়োয়ারীরাও দিতে পারে নাই—একেই বলি বাঙালীর মস্তিষ্ক! আজ এইটুকু শুনাইয়া রাখিলাম, পরে ভালো করিয়া হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙিব।"

রাগে, অপমানে ফুলতে ফুলতে আলোকনাথ মুঠার ভিতরে কাগজ-খানাকে নিয়ে নুটির মত পাকিয়ে ফেল্‌লে। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে, হঠাৎ সে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

রাধারাণী তার মুখ-চোখ দেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কোথা যান?"

—"এই কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা কর্‌তে।"

—"কেন আলোকবাবু?"

কথার কোন জবাব না দিয়েই আলোকনাথ ঘর থেকে ঝড়ের মত একেবারে বাইরে গিয়ে পড়্‌ল। তারপরেই নীচে থেকে তার গলা শোনা গেল,—চাকরকে ডেকে সে বল্‌ছে—"ওরে রামা, আস্তাবল থেকে শীগ্‌গির ঘোড়ার চাবুকটা এনে দে তো রে!"

.........ঘণ্টা-দুই পরে আলোকনাথ যখন হাস্‌তে হাস্‌তে আবার ফিরে এল, মুকুলমালা তখন সুধোলে, "হ্যাঁ আলোদাদা, বাঙ্‌লাদেশে একজন সম্পাদকের আসন খালি হোলো না তো?"

আলোকনাথ পরিতৃপ্ত স্বরে বল্‌লে, "না, কোন সম্পাদকের কর্ম্ম খালি

হয়নি, বরং আমিই লোকসান ক'রে এলুম। সেই অসভ্য গাধার পিঠে আমার অমন দামি চাবুকগাছা ভেঙে গেছে।"

—"তাহ'লে তার পিঠখানা আর আস্ত রেখে আসোনি বল!"

—"না মুকুল, বাঙ্‌লা কাগজের সম্পাদকের পিঠকে তুমি কাঁচের পেয়ালার মত অতটা ঠুন্‌কো ভেবো না। বিশেষ, তার পিঠে সইবে ব'লে আমি তাকে পেটেও যৎকিঞ্চিৎ খাইয়ে এসেচি।"

—"কি খাইয়ে এসেচ আলোদাদা?"

—"সেই কুৎসাভরা কাগজখানা তার সাম্‌নে ফেলে দিয়ে আমি বল্‌লুম, 'যে গরল তুই উদ্গার করেচিস্, এই কাগজসুদ্ধ সেই গরলটা তুই নিজেই খা!'—তারপর যতক্ষণ-না আমার হুকুমমত সমস্ত কাগজখানা সে গিলে ফেল্‌লে, ততক্ষণ আমার ঘোড়ার চাবুক একবারও বিশ্রাম কর্‌তে পায়নি। খালি আমাকে গালাগাল দিলে আমি সব চুপ ক'রে সয়ে থাক্‌তুম, কিন্তু সে তোমাদের ওপর অভদ্র ইঙ্গিত করেচে—এত স্পর্দ্ধা তার!"

—"যদি সে নালিস্ করে?"

—"জরিমানা দিয়ে আস্‌ব। তাতে আমার আপত্তি নেই।"

আরো অনেকগুলো কাগজ 'সুহৃদ'রা লাল-নীল পেন্সিলের দাগ দেগে আলোকনাথের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আলোকনাথ সেই পেন্সিলের লালিমা আর নীলিমা দেখেই বুঝে নিলে তাদের ভিতরে কি আছে! কাগজগুলো না প'ড়েই টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌লে, "যত পড়্‌ব, তত রাগ হবে, তত ঘোড়ার চাবুক ভাঙ্‌তে হবে,—আমার চাবুকের দাম এত সস্তা নয়! কিন্তু আমি এই ভেবেই আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, এই কাগজ-ওলাগুলো কোন্ মুখে পাঞ্জাবের ব্যাপার নিয়ে ডায়ার আর ওডায়ারকে আক্রমণ করেছিল! স্বজাতির ওপরে, নারীদের ওপরে এরাও তো ডায়ার-ওডায়ারের চেয়ে কম অত্যাচার করে না!

পাঞ্জাবে হাঙ্গাম হয়েছিল দুদিনের জন্তে ;—কিন্তু হিন্দুনারীর ওপরে যে অত্যাচার চল্‌চে শত শত বৎসর ধ'রে !"

পরদিন সকালেই আলোকনাথের পাড়া থেকে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য প্রমুখ একদল সুহৃদ এসে দেখা কর্‌লেন,—খুব সম্ভব এঁদেরই অতিরিক্ত সদয় অনুগ্রহে আলোকনাথ খবরের কাগজগুলো বিনা খরচে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল। একেই তার মন কটুরসে তিক্তবিরক্ত হয়ে ছিল—তার উপরে স্বশরীরে এই-সব অপরূপ মূর্ত্তি দেখে সে একেবারে রেগে টং হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মনের তাপ কোনরকমে সাম্‌লে নিয়ে সে বল্‌লে, "এই যে ভট্টাচায্যি-মশাই, এই যে, সঙ্গে আপনারাও আছেন দেখ্‌চি,—তা থাক্‌বেন বৈকি, দল কখনো দলপতির সঙ্গছাড়া হ'তে পারে না! বেশ, বেশ! কিন্তু ব্যাপার কি বলুন দেখি? পাড়ার তাস-দাবার আড্ডা, ঘোঁটের সভা ছেড়ে, একেবারে এই বেপাড়ায় আমার মত পাষণ্ডের বাগানবাড়ীতে অকস্মাৎ মশাইদের আবির্ভাব দেখে আমি একটু চিন্তিত হচ্ছি। আবার কি বারোয়ারির চাঁদা-আদায়ে বেরিয়েচেন? কিন্তু এতখানি কষ্ট ক'রে এতদূরে আস্‌বার কি প্রয়োজন ছিল? আপনারা তো জানেনই যে বারোয়ারিতে চাঁদা দেওয়ার চেয়ে সে টাকাগুলো রাস্তায় ফেলে দেওয়া আমি ঢের ভালো মনে করি!"

অভ্যর্থনার বহর দেখেই গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য সদলবলে যার-পর-নাই দমে গেলেন। "হরিনামামৃত" নামে গানের বই লিখে বাঙালী ভক্তদের কাছে প্রসিদ্ধ, পরম-বৈষ্ণব খাঁদাকোহরি-বাবু বল্‌লেন, "না আলোকনাথ, আজ আমরা তোমার কাছে বারোয়ারির চাঁদা আদায় কর্‌তে আসিনি।"

—"তবে? বঙ্গ-ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে আপনাদের কোন নতুন আপত্তি জানাতে এসেচেন বুঝি?"

—"তাও নয়।"

—"তাও নয়! তবে কি আমার এই আশ্রম নিয়ে কোন আলোচনা কর্‌তে এসেচেন? তাহ'লে আলোচনায় যোগ দেবার আগে একটা কথা আপনাদের সকলকে জানিয়ে রাখ্‌তে চাই। সেদিন রাত্রে আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্নাদেশ পেয়েচি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখ্‌লুম, যেন মা-কালী এতখানি রাঙা জিভ্‌ বার ক'রে খাঁড়া নেড়ে আমাকে বল্‌চেন, 'বৎস আলোকনাথ, তোর আশ্রম নিয়ে যে তোকে কিছু বল্‌তে আস্‌বে, তাকেই তুই বিনা-দ্বিধায় হত্যা ক'রে ফেল্‌বি,—আমার অনুগ্রহে এতে তোর কোনই পাপ হবে না!' দেখুন তো মশাই, এ কি মুস্কিল! মা-কালী সেই আদ্যি-কালের বদ্যি বুড়ী, একালের আইন-কানুনের তো কোন খবর রাখেন না! খুন অম্‌নি কর্‌লেই হোলো কিনা! মা-কালীর কৃপায় খুনে এখন পাপ না হ'তে পারে, কিন্তু হাকিমের হুকুমে ফাঁসিটা খুব অনায়াসেই হ'তে পারে! অথচ মা-কালীর স্বপ্নাদেশও তো অমান্য কর্‌তে পারি না! তাই আশ্রমের কথা নিয়ে আলোচনা ক'রেছিল ব'লে কাল আমি একটা কাগজের সম্পাদকের পৃষ্ঠদেশে সাদরে ঘোড়ার চাবুক বুলিয়ে এসেচি। তার পিঠ এখন ফুলে জয়ঢাক হয়ে উঠেচে, বিশ্বাস না-হয় স্বহস্তে বাজিয়ে দেখে আসুনগে!"

আগন্তুকরা বড়ই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়্‌লেন। গঙ্গাধর ক্ষীণস্বরে বল্‌লেন, "বাবা আলোক—"

বাধা দিয়ে আলোক বল্‌লে, "আপনারা আমার প্রতিবেশী, তায় বয়সে বড়, তায় সমাজের চাঁই। আপনারা আজ যদি আশ্রমের কথা তোলেন, তাহ'লে অবশ্য আমি আপনাদের প্রাণ হত্যা বা পিঠ জয়ঢাক,—কিছুই কর্‌তে পার্‌ব না।"

গঙ্গাধর কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লে, "বাবা আলোকনাথ, তুমি যে কত-বড় বুদ্ধিমান ছেলে, তা কি আমরা জানি না?"

বিরিঞ্চি চক্রবর্ত্তী বল্লেন, "কি বল হে থাকোহরি, এই কালই তো আমাদের কথা হচ্ছিল যে, আলোকনাথ আমাদের বড়ই ভক্তি করে, রূপে-গুণে অমন সোনার টুক্‌রো ছেলে একালে আর দুটি দেখা যায় না।"

আলোকনাথ মৃদু হেসে বল্লে, "এইতেই প্রমাণ হচ্ছে, আপনারা আমাকে কতটা ভালোবাসেন, স্নেহ-দরদ করেন। কিন্তু আপনারা সকলেই যখন অহিন্দুর মস্তকভক্ষক, হিন্দুসমাজের রক্ষক, তখন আপনারা বিলক্ষণই বুঝতে পার্‌চেন যে, হিন্দুসন্তান হয়ে আমার পক্ষে স্বপ্নাদেশ একেবারে অগ্রাহ্য করা মহাপাপ। কিন্তু আপনাদের হত্যা কর্‌লে আমাকেও ফাঁশী যেতে হবে। হত্যার বদলে প্রহার কর্‌লেও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি অসম্মান দেখানো হবে। অথচ আপনারা যদি আশ্রমের কথা তোলেন, আর আমি চুপ ক'রে ব'সে ব'সে তাই শুনি, তবে মা-কালী মুখভার কর্‌তে পারেন। অতএব, আমি মধ্যপথ অবলম্বন কর্‌ব। অর্থাৎ আশ্রমের কথা তুল্‌লেই আমি আপনাদের সকলকেই একে একে কোলপাঁজা ক'লে তুলে, এই দুতালার জান্‌লা গলিয়ে রাস্তার ওপরে টুপ্ ক'রে ছেড়ে দেব। কেমন, এ প্রস্তাবে রাজি আছেন?"

গঙ্গাধর হতাশভাবে বল্লেন, "বাবা আলোকনাথ, আমরা তোমার আশ্রম নিয়ে কোন কথাই বলতে চাই নি, আর সেজন্যেও এখানে আসিনি। অনেকদিন তুমি পাড়া-ছাড়া, তাই কেমন আছ, কি বৃত্তান্ত, তাই জান্‌তে আমরা সবাই আজ এখানে এসেচি।"

আলোকনাথ ব'লে উঠ্‌ল, "বটে, বটে, বটে! পাড়ায় থাক্‌তেই আপনাদের দেখা পেতুম ন-মাসে ছ-মাসে, আর আজ মাসখানেক পাড়া ছেড়েচি ব'লে, আপনারা সদলবলে এই পাঁচ মাইল পথ পেরিয়ে আমার কুশল-জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেচেন? আহা, আমার কি সৌভাগ্য! আপনাদের কি দয়ার শরীর! একি, তাইত! এখনো

আপনারা দাঁড়িয়ে রয়েচেন কেন? বসুন, বসুন—জান্বেন, এ আপনাদেরই বাড়ী! দয়া ক'রে যখন পায়ের ধূলো দিয়েচেন, তখন অম্নি ছাড়্ব না, কিছু জলযোগ ক'রে যেতেই হবে!"

গঙ্গাধর বল্লেন, "না বাবা, দেখাশুনো তো হ'ল, অনেকদূর যেতেও হবে—এখন আমরা আসি। জলযোগ আর একদিন হবে অখন।"

আলোকনাথ বল্লে, "ধূলো-পায়েই বিদায়? আরে রামঃ, তাও কি হয়! (উচ্চৈস্বরে) মহাদেও পাঁড়ে, লাঠি ঘাড়ে ক'রে দরজা আগ্লে ব'সে থাকো, আমার হুকুম না পেলে কারুকে বেরুতে দিও না—খবর্দ্দার! একি, এখনো আপনারা বস্লেন না?"—এই ব'লে সে উঠে দাঁড়াল।

'গোঁয়ারটা'কে উঠে দাঁড়াতে দেখে সকলেই ভয়ে ভয়ে একে একে ব'সে পড়্লেন।

আলোক বল্লে, "তারপর থাকোহরিবাবু, আপনার গরুর চাম্ড়ার দোকানখানি কেমন চল্চে?"

থাকোহরি দুহাতে দুকাণ ঢেকে ফেলে বল্লেন, "অমন কথা মুখেও উচ্চারণ কোরোনা, আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস, শুন্লেও পাপ হবে। সে দোকান আমার শ্যালকের, আমি অনেক বারোণ করেছিলুন, কিন্তু সে পাষণ্ড আমার কোন কথাই মান্লে না, দোকান কর্লে তবে ছাড়্লে।"

—"হ্যাঁ, দোকানে আপনার শ্যালককেই দেখেচি বটে। কিন্তু আমি শুনেচি, আপনার টাকাতেই দোকান হয়েচে আর লাভের তিনভাগ নাকি আপনার হরিনামের ব্যাগ—থুড়ি—ঝুলির ভেতরেই সঞ্চিত হয়।"

—"ও-সব দুষ্টলোকের মিথ্যা রটনা!"

—"তা হবে। কিন্তু থাকোহরিবাবু, হরিনামের ঝুলিটি আজ আপনার গলায় ঝুল্চে না যে? পকেটে আছে বুঝি?"

—"না, বাড়ীতে রেখে এসেচি।"

—"কেন অমন কাজ কর্‌লেন? বিদেশে পথিক যেমন মণিব্যাগে পাথেয় নিয়ে বেরোয়, আপনিও পথে বেরুবার সময়ে এবার থেকে হরিনামের ঝুলিটি যেন পকেটে নিতে ভুল্‌বেন না—ওর মধ্যে পরলোকের পথের পাথেয় থাকে। রাস্তায় আজকাল যে-রকম মোটরের উৎপাত—কি জানি, বলা তো যায় না। শেষটা কি পাথেয়ের অভাবে বৈকুণ্ঠধামে যাওয়া হবে না, কি বলেন বিরিঞ্চি-বাবু?"

আলোকনাথের দিকে একবার সকোপ-কটাক্ষে চেয়ে থাকোহরি ঘাড় হেঁট্ ক'রে বসে রইলেন।

আলোকের হুকুমে চাকর কয়েকখানি থালায় ক'রে খাবার সাজিয়ে আন্‌লে।

আলোক গঙ্গাধরের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "ভট্‌চায্যি-মশাই, শুনেচি বন্ধুমহলে লুকিয়ে ফাউল কাটলেট্ ভক্ষণ কর্‌তে আপনার আপত্তি নেই। খানকয়েক আনিয়ে দেব নাকি?"

গঙ্গাধর থু থু ক'রে থুথু ফেলে রুষ্টস্বরে বল্‌লেন, "না, না, দুর্গা-শ্রীহরি! আমি ফাউল কাট্‌লেট—ছি ছি, শুনেই যে বমনোদ্রেক হচ্চে!"

আলোকনাথ মুখ টিপে হেসে বল্‌লে, "ওহো, এঁদের সাম্‌নে ও-জিনিসটি খেতে বুঝি আপনার আপত্তি আছে? তাহ'লে আজ খালি মিষ্টান্নেই তুষ্ট হয়ে যান!"

সকলে বিনা-গোলোযোগে জলযোগে প্রবৃত্ত হলেন—তাঁদের সেদিনকার খাওয়ার ধরণ দেখে আলোকনাথের মনে হ'তে লাগ্‌ল, যেন হাঁড়িকাঠের সাম্‌নে বলির পাঁঠারা তৃণভক্ষণ কর্‌ছে।

তেরো

মুকুলমালা মাছের কচুরি গড়্‌ছিল, আর রাধারাণী একটি তোলা-উনুনের সাম্‌নে ব'সে একে একে সেগুলি ভেজে ফেল্‌ছিল।

ছ্যাঁক্-কল্-কল্ আওয়াজ আর ভুর্‌ভুরে গন্ধ পেয়েই অন্য ঘর থেকে আলোকনাথ এসে হাজির হোলো। খানিকক্ষণ ভাজা কচুরিগুলোর দিকে লুব্ধ-চক্ষে চেয়ে থেকে, দুটো সরস ঢোঁক্ গিলে বল্‌লে, "আর তো অপেক্ষা করা চল্‌ল না,—রাধারাণী, দয়া ক'রে হুকুম দাও, একখানা চেকে দেখি!"

খুন্তি ক'রে থালা থেকে একখানা কচুরি তুলে নিয়ে, রাধারাণী আলোকের পাতা হাতের উপরে ফেলে দিলে। আলোকের আর তর্ সইল না—যেমন পাওয়া, অম্‌নি খাওয়া! সঙ্গে সঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে, প্রাণপণে মুখ-ব্যাদান ক'রে ঊর্দ্ধমুখে সে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইল—না-পারে গিল্‌তে, না-পারে ফেল্‌তে—কচুরিখানা ঠিক্ জ্বলন্ত অঙ্গারের মতই গরম!

রাধারাণী সকৌতুকে বল্‌লে, "কি হোলো বাক্যবাগীশ মশাই?"

মুকুলমালাও খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বল্‌লে, "হবে আর কি, সাপের ব্যাঙ্-ধরা হয়েচে! দাদার আমার সব-তাতেই তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি!"

অনেকটা সাম্‌লে নিয়ে আলোকনাথ বল্‌লে, "লোভে পাপ আর পাপে গরম কচুরি-লাভ! বদন-বিবরটিকে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড।"

রাধারাণী সুধোলে, "কেমন হয়েচে?"

আলোকনাথ বল্‌লে, "ভগবান জানেন।"

—"খেলেন আপনি, ভগবান জানেন কি-রকম?"

—"একি আর খাওয়া হোলো? সোয়াদ বুঝ্‌বার সময় পেলুম না—যেন-তেন-প্রকারেন প্রায় আস্ত-অবস্থাতেই কচুরিখানা কোঁৎ ক'রে উদরজাত কর্‌চি।"

—"আর একখানা খাবেন?"

—"ওরি-মধ্যে ঠাণ্ডা দেখে যদি একখানা দাও, অনায়াসে আমার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত কর্‌তে রাজি আছি।"

রাধারাণী আর-একখানা কচুরি দিলে, আলোকনাথ সেখানা নিয়ে এবারে আগে খানিকক্ষণ ধ'রে হাতের উপরে নাচাতে লাগ্‌ল—তারপর সেখানা মুখে ফেলে চর্ব্বণ কর্‌তে কর্‌তে আহার-পুলকে পরিতৃপ্ত স্বরে বল্‌লে, "কেমন হয়েচে, বলা বাহুল্য।"

রাধারাণী বল্‌লে, "মাসিকপত্রের মতন অমন সংক্ষিপ্ত সমালোচনা কোন কাজেরই নয়। ও হচ্চে 'অশ্বত্থামা হত' ব'লে ফাঁকি দেবার চেষ্টা। কি কি দোষ হয়েচে, খুলে বলুন।"

—"দোষ? কিছু নেই! এই খুঁৎপূর্ণ জগতে তোমার হাতে ভাজা কচুরিখানি একেবারে নিখুঁৎ হয়েচে। এর গুণের কথা অবর্ণনীয়—পঞ্চমুখে আহার ক'রে ব্রহ্মাও বল্‌তে পার্‌বেন না! রন্ধন-কলায় তুমি অমর আর্টিষ্ট দ্রৌপদীর চেয়েও মৌলিকতা দেখিয়েচ—কারণ, দ্রৌপদী যে এমন মাছের কচুরি রাঁধ্‌তে জান্‌তেন, মহাভারতের কোথাও তার প্রমাণ নেই!"

মুকুলমালা বল্‌লে, "বেশ আলোদাদা, বেশ! তোমার এক চোখো তারিফের বহর দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি! আমি যে এতক্ষণ ধ'রে ঠায় ব'সে ব'সে কচুরিগুলো গড়্‌লুম, তুমি তো তার উল্লেখ পর্য্যন্ত কর্‌লে না! বেশ ভাই যা-হোক্, রইল তোমার কচুরি-গড়া—আমি এই চল্‌লুম!"

—"আহা হা-হা, শোনো শোনো—রাগ সাম্‌লে লক্ষ্মী হয়ে বোসো। কচুরির মূর্ত্তি-গঠনে বিশ্বকর্ম্মাও যে তোমার কাছে হার মান্‌তে বাধ্য, এ-কথাও আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌চি! তোমরা দুজনেই অতুলনীয়া।"

হঠাৎ বাইরে কার চুড়ির রণ্‌-রণ্‌ ও জুতোর শব্দ হোলো। আলোকনাথ মুখ তুলে সবিস্ময়ে দেখ্‌লে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, মঞ্জরী!

মুহূর্ত্তে আলোকনাথের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে বল্‌লে, "তুমি!"

মঞ্জরী বল্‌লে, "হ্যাঁ আলোকবাবু, ব্যাপার কি বলুন দেখি? এতদিন কোন খোঁজখবর নেই, আমরা ভেবে সারা হচ্ছি, ও বাড়ী থেকে ঠিকানা নিয়ে একেবারে এখানে আস্‌চি"—বল্‌তে বল্‌তে সে ঘরের ভিতরে ঢুকে, রাধারাণী আর মুকুলমালাকে দেখেই চম্‌কে ও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার সারা মুখখানা মড়ার মতন সাদা হ'য়ে এল!

রাধারাণী আর মুকুলমালাও অবাক ছবির লেখার মত তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল!

আলোকনাথ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "চল, চল, অন্য ঘরে চল!"

মঞ্জরী কলের পুতুলের মত ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "না!"—তার মুখ তখন অব্যক্ত কি-এক গভীর বেদনায় বিকৃত হয়ে গেছে।

একটু ইতস্তত ক'রে আলোকনাথ আবার বল্‌লে, "তোমাকে অনেক কথা বল্‌বার আছে, মঞ্জু! তুমি অন্য ঘরে এলে আমি সুখী হব!"

—"না।"

—"তবে রাধারাণী, মুকুলমালা, তোমরা খানিকক্ষণের জন্যে অন্য ঘরে যাবে কি? এঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

মঞ্জরী বিরক্ত স্বরে বল্‌লে, "না, ওদেরও যেতে হবে না—এ বাড়ী থেকে আমিই চ'লে যাচ্ছি!"

—"সে কি মঞ্জু!"

মঞ্জরীর দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। ঝাঁঝালো স্বরে সে বল্‌লে, "আলোকবাবু, আপনার মুখে আমি আর আমার নাম শুন্‌তে চাই না! এতক্ষণে আমি বুঝ্‌লুম, কেন আর আপনি আমাদের বাড়ীতে যান না।"

আলোকনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লে, "তুমি যা বুঝেচ, ভুল বুঝেচ।"

মঞ্জরী ঘৃণায় ভুরু কুঁচ্‌কে বল্‌লে, "আমার চোখদুটো কাণা নয়—আমি কিছুমাত্র ভুল বুঝিনি। আজ ক'দিন ধ'রে যে-সব কথা শুন্‌চি, যা আমি বিশ্বাস কর্‌তে পারিনি, তা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, এই তো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ!"

—"কী তুমি শুনেচ?"

—"থাক্, তা আর বল্‌বার দরকার নেই!"—ব'লেই মঞ্জরী আর-একবার রাধারাণী ও মুকুলমালার দিকে প্রদীপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, আচম্বিতে ঘর থেকে একেবারে বেরিয়ে গেল।

আলোকনাথ সকাতরে ডাক্‌লে, "মঞ্জু, মঞ্জু!"

কিন্তু মঞ্জরী দাঁড়ালও না—ফিরেও চাইলেনা!

আলোকনাথ অভিভূতের মত যেখানে ছিল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। মঞ্জরী কি যে শুনেছে এবং কি দেখে আর কি বুঝে সে যে অমন মূর্ত্তিমতী ঘৃণার মত চলে গেল, আলোকনাথ সেটা অনায়াসেই আন্দাজ কর্‌তে পার্‌লে। পাছে শেষে এই বিভ্রাট ঘটে, এই ভয়েই সে সত্যানন্দ-বাবুকে আশ্রম-স্থাপন সম্বন্ধে সব কথা আগে থাক্‌তেই খুলে বল্‌তে গিয়েছিল; ভেবেছিল, সত্যানন্দবাবু যে-রকম উদার-প্রকৃতির মানুষ, তাতে তিনি তার উদ্দেশ্যে কোন সন্দেহ-প্রকাশ না ক'রে সহানুভূতি

প্রকাশই করবেন। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তখন মাস-খানেকের জন্যে বিদেশে প্রস্থান ক'রেছিলেন।

সেদিন মঞ্জরীর সঙ্গে তার দেখা ও অনেক কথা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাকে সে তার উদ্দেশ্যের কথা খুলে বলতে পারে নি। আলোকনাথ জানত, এ-সম্বন্ধে স্ত্রীলোক-মাত্রেরই একটা অন্ধতা থাকা স্বাভাবিক। তার উপরে এ ব্যাপারটার ভিতরে খানিকটা এমন কুৎসিত অংশও জড়ানো ছিল, মঞ্জরীর মত তরুণীর কাছে যা প্রকাশ করা সে সঙ্গত মনে করে নি। স্থির ক'রেছিল, সত্যানন্দবাবু ফিরে এলে পর একেবারে তাঁর কাছেই সব কথা বলবে।

তার পর থেকেই সে আশ্রম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে। একলা মানুষ,—বৃহৎ অনুষ্ঠান। কাজের সুবিধার জন্য নিজের বসত-বাড়ী পর্য্যন্ত ছেড়ে এসেছে। মঞ্জরীর কথা অনেকবার মনে হ'লেও, তার সঙ্গে আর দেখা করবার সময় পায় নি। কিন্তু এরি মধ্যে মঞ্জরী যে আশ্রম-সম্বন্ধে কাণাঘুষো, অপবাদ শুনতে বা নিজেই এখানে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা আলোকনাথের মাথায় মোটেই উদয় হয় নি!

আলোকনাথ অস্থির পদে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল—মাথায় এখন তার খালি এক চিন্তা,—এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, কি করা কর্ত্তব্য!

রাধারাণী আর মুকুলমালা ঘরের এককোণে স'রে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এই যে রূপসী তরুণী দমকা দখিন-হাওয়ার মত হঠাৎ ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল এবং পরক্ষণেই কালবৈশাখীর মত সকলকে অভিভূত ক'রে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, এ যে কে, তারা কিছুই বুঝতে পারলে না। আলোকনাথ নিজেও কোনদিন এর কথা তাদের কাছে উল্লেখ পর্য্যন্ত করে নি; অথচ এ মেয়েটির সঙ্গে আলোকনাথের

সম্পর্ক যে কতটা ঘনিষ্ঠ, তার ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা দেখে এটা তার পরিষ্কার ধর‍্তে পার‍্লে। রাধারাণীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি যেন আরো একটি গভীর গোপনতার ভিতরে প্রবেশ করেছিল, আলোকনাথের এখনকার ভাবভঙ্গি দেখে তার সে সন্দেহ বেশী দৃঢ় হয়ে উঠ্‌ল! কিন্তু সেটা নিয়ে এখন আর তার মাথা ঘামাতে ইচ্ছা হোলো না। এই মেয়েটি যে আলোকনাথের সঙ্গে তাদের দেখেই এমন ঘৃণাভরে চ'লে গেল এবং এখানে এসেও তার যে-ঘৃণ্য জীব সেই ঘৃণ্য জীবই যে আছে, তাদের অস্পৃশ্যতার সংসর্গে আসাও যে সকলে পাপ মনে করে, এই দুঃখ-খেদ-অপমানের ব্যথাই তার বুকের ভিতরে যেন দুম্ দুম্ ক'রে মুগুরের ঘা মার‍্ছিল। তারা ছিল নরকে, এসেছে স্বর্গে; কিন্তু স্বর্গে থাক্‌বার অধিকার পেয়েও তারা নারকীর মতই অভিশপ্ত!······এ কী জীবন!

রাধারাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা কর‍্লে, "আলোকবাবু, উনি কে?"

আলোকনাথ অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলে,—কোন জবাব দিলে না।

—"উনি কি আপনার আত্মীয়?"

—"না।"

—"তবে?"

আলোকনাথ নিরুত্তর হয়ে একখানা চেয়ারের উপরে গিয়ে ব'সে পড়্‌ল। তার প্রাণের ভিতরে তখন একটা বোবা হাহাকার যেন বুক ফেটে বাইরে বেরিয়ে আস্‌বার জন্যে মাথা-কুটোকুটি ক'রে মর‍্ছিল।

—"উনি কি আমাদের দেখেই চ'লে গেলেন?"

—"হুঁ।"

রাধারাণী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর ব্যথিত স্বরে

ধীরে বল্‌লে, "আলোকবাবু, খালি উনি নন, সমস্ত দেশ আপনার বিরুদ্ধে, —এত শত্রুর সঙ্গে আপনি একলা কি ক'রে যুঝ্‌বেন ? আমরা অস্পৃশ্য জীব, আমাদের জন্যে কেন আপনি এত কষ্ট পাবেন ?"

আলোকনাথ রাধারাণীর চোখের উপরে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলে, "রাধারাণী, আমাকে তুমি কি করতে বল ?"

—"আমাদের আবার তাড়িয়ে দিন।"

—"মুকুল, তোমারও কি ঐ মত্ ?"

মুকুলমালা আকুল স্বরে বল্‌লে, "তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আলোদাদা ?"

—"রাধারাণীকে জিজ্ঞাসা কর।"

—"হ্যাঁ দিদি, আমরা কোথায় যাব ?"

রাধারাণী অধোবদনে চুপ ক'রে রইল।

—"না দিদি, আমি আলোদাদাকে ছেড়ে যাব না।"

আলোকনাথ উঠে দাঁড়িয়ে দরদ-ভরা স্বরে বল্‌লে, "না বোন, আমিও ছেড়ে যেতে দেব না—তোমাকেও না, আর কারুকেও না। সমাজ আমাকে ছাড়ে,—ছাড়ুক্, কিন্তু তোমরা তো আছ ! তোমাদের নিয়ে আমি আবার এক স্নেহময়, আনন্দময়, সৌন্দর্য্যময় নূতন সমাজ গড়্‌ব—দেবরূপী সয়তানের ছায়া যার ত্রিসীমানায় ঘেঁস্‌তে পারবে না।"

রাধারাণী মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছ্‌লে।

মুকুলমালা আলোকের কথায় হাঁপ ছেড়ে ব'লে উঠ্‌লো, "ও দিদি, কোন্ দেশের রাঁধুনী তুমি গা ? উনুন যে জ্ব'লে যাচ্চে, দাদার যে ক্ষিদে বাড়্‌চে, কচুরিগুলো কখন্ ভাজা হবে বল দেখি ! নাও, কড়া চড়িয়ে দাও, এস দাদা, ব'সে পড়—আজ তুমি যত চাইবে তত পাবে—এস, এস ! আমি গড়ি, দিদি রাঁধো, দাদা খাও !"

চোদ্দ

পরদিন ঘরে ব'সে সত্যানন্দবাবু কি একখানা বই পড়ছেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখলেন, আলোকনাথ ঘরে ঢুকছে। তাকে দেখেই তাঁর মুখের উপরে একটা অপ্রসন্ন ভাব ঘনিয়ে উঠল। খবরের কাগজে তিনি আশ্রমের কথা পড়েছিলেন, আরো অনেক কথা মঞ্জরীর মুখে শুনেছিলেন। তার পরেও যে আলোকনাথ তাঁর বাড়ী মাড়াতে পারে, এতটা তিনি ধারণা করতেও পারেননি।

আলোকনাথ কিন্তু সত্যানন্দবাবুর মুখের ভাব দেখেও দেখলে না! সে নমস্কার ক'রে সহজ স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন আছেন সত্যানন্দবাবু? কবে এলেন?"

—"দিন-ছয়েক।"

আলোকনাথ একখানা চেয়ার টেনে এনে ঠিক সত্যানন্দবাবুর সামনেই ব'সে পড়ল। সত্যানন্দবাবু বিরক্ত মুখে আবার পুস্তকের উপরে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলেন।

আলোকনাথ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে, "আমরা এমন চুপচাপ সামনা-সামনি কতক্ষণ ব'সে থাকব সত্যানন্দবাবু?"

—"আমাকে কি ক'রতে বল?"

—"সুবিচার।"

—"সুবিচার! খবরের কাগজে তোমার সম্বন্ধে কি-সব কুৎসিত কথা বেরিয়েচে, দেখেচ?"

—"দেখেচি। কিন্তু কুৎসা যাদের ব্যবসা, তাদের কথায় আপনি কি বিশ্বাস করেন?"

—"বিশ্বাস যে করব না তারই বা প্রমাণ কৈ? মঞ্জু কাল তোমার ওখানে গিয়েছিল। সেও—"

—"মঞ্জু যা দেখেচে, তা আমি জানি। কিন্তু এ-সব কথার আগে আপনি আমার গুটিকতক কথা ধীরভাবে শুনবেন কি? না যদি শোনেন, আমি না-হয় বিদায় হচ্চি। তবে শুনলেই বোধ করি ভালো হয়। কারণ আমার ওপরে অত্যন্ত অবিচার করা হয়েচে।"

—"আচ্ছা, সত্যিই যদি তোমার কিছু বলবার থাকে, বলতে পারো। অন্যায় আমি কারুর ওপরেই করতে চাই না।"

আলোকনাথ একটুও ইতস্তত করলে না, পরিষ্কার স্বাভাবিক স্বরে সেই ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে রাধারাণী ও মুকুলমালার সঙ্গে প্রথম দেখা থেকে সুরু ক'রে, আশ্রম-স্থাপন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই একে একে ধীরে ধীরে সে ব'লে গেল—কিছুই বাদ দিলে না বা লুকোলে না।

সমস্ত শুনে সত্যানন্দবাবু মাথা হেঁট ক'রে ব'সে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

আলোকনাথ বললে, "এই আমার কথা। আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন জানিনা, কিন্তু আমি যা করেচি তা আপনাকে সমস্তই বললুম। তবে আপনি যদি আমাকে বিশ্বাস না করেন, সে স্বতন্ত্র কথা।"

সত্যানন্দবাবু মৃদুস্বরে বললেন, "বাবা আলোক, আমি তোমাকে কখনো মিথ্যাবাদী ব'লে সন্দেহ করিনি। আজও তুমি সত্যকথাই বলেচ। অনেক কাল দুনিয়ায় আছি, মানুষ বোধ হয় কিছু-কিছু চিনতে পারি।"

—"এখন বলুন দেখি সত্যানন্দবাবু, আপনারা আমার ওপরে অবিচার করেচেন কিনা?"

—"করেচি। কিন্তু অবস্থা-গতিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এটা কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলুম। তবু তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

—"ক্ষমা কর্‌বার কিছু নেই, কিন্তু আপনি যে আমাকে বিশ্বাস করেচেন, এইতেই আমি সুখী হয়েচি।"

—"তুমি যে কত-বড় নির্ভীক, অকপট আর সহৃদয়, তা বুঝে নিজেকে আমার বড়ই ছোট মনে হচ্চে! তুমি যা করেচ, তোমার অবস্থায় পড়্‌লে আমি কখনোই তা কর্‌তে পার্‌তুম না। কিন্তু বাবা আলোক, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। তোমাকে দুঃখ দেবার ইচ্ছে আমার নেই, তোমার চরিত্রেও আমি সন্দেহ কর্‌চি না। তবু আমাকে বল্‌তে হচ্চে যে, তোমার সঙ্গে মঞ্জুর বিবাহ দিতে পারি, এ সাহস আর আমার নেই।"

আলোকনাথ সচমকে সত্যানন্দবাবুর মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলে! তার মুখ আবার ফ্যাকাসে হয়ে গেল! এ কথার অর্থ কি?

সত্যানন্দবাবু দুঃখিত স্বরে বল্‌লেন, "এটা আমারি দুর্ভাগ্য বল্‌তে হবে। কারণ তোমার মত জামাই আমি আর পাব না। তবে তুমি যদি এখনো আশ্রম তুলে দাও—"

আলোকনাথ বাধা দিয়ে বল্‌লে, "অসম্ভব সত্যানন্দবাবু, সে আমি কিছুতেই পার্‌ব না।"

—"তুমি যে ঐ কথাই বল্‌বে, তা আমি আগে থাক্‌তেই জানি। আর এজন্যে তোমাকে আমি বিশেষ অনুরোধ কর্‌তেও চাই না। কারণ আমিও বেশ বুঝি যে, মানুষের জীবন তুচ্ছ মাটির পাত্র নয়,—অপবিত্র হাতে কোন বাধা না মেনে একবারমাত্র কেউ স্পর্শ কর্‌লেই তাকে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া চলে না! তুমি যে আত্মত্যাগ স্বার্থত্যাগ ক'রে অভাগীদের উদ্ধার-ব্রত নিয়েচ, এজন্যে তোমাকে আমার মনের শ্রদ্ধা জানাচ্চি। কিন্তু এর বেশী আর কিছু কর্‌বার সাধ্য আমার নেই।"

আলোকনাথ বল্‌লে, "আপনি যখন আমার মতের বিরোধী নন, তখন মঞ্জুকে আমার হাতে দিতে আপনার এমন আপত্তি কেন?"

সত্যানন্দবাবু বল্‌লেন, "আমাদের সমাজও আমার কাজে সায় দেবে না। বুড়ো হয়েচি, সমাজের সঙ্গে এ বয়সে আর যুঝ্‌বার শক্তি নেই।"

আলোকনাথ উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লে, "আপনাদের সমাজও তাহ'লে হিন্দু-সমাজের মতই সংকীর্ণ! কেবলমাত্র জাতিভেদ তুলে দিয়েচে ব'লে আপনাদের সমাজকেও আমি উদার বল্‌তে পারব না, জাতিভেদ তো হিন্দু-সমাজেরও অনেক সম্প্রদায়ে নেই! পুরাতন বৃহৎ হিন্দুসমাজের পাশে তবে এই ক্ষুদ্র নূতন সমাজ গড়্‌বার কি দরকার ছিল? একেশ্বরবাদ? হিন্দু-সমাজেও একেশ্বরবাদীর অভাব নেই!"

—"বাবা আলোক, ও-সব কথা নিয়ে দেশে অনেক বাদপ্রতিবাদ আর লেখালেখি হয়ে গেছে, তা নিয়ে আমি আর কিছু বল্‌তে চাই না। তবে আমাদের সমাজের সংকীর্ণতার কথা যে বল্‌লে, ওটা খালি আমাদের সমাজে কেন, পৃথিবীর সকল সমাজেই আছে। সব সমাজই স্থল-বিশেষে সংকীর্ণ হতে বাধ্য। সমাজমাত্রই অধিকাংশের মঙ্গলের জন্যে অল্পাংশকে ত্যাগ ক'রে থাকে।"

—"কিন্তু সমাজ-মাত্রেই অধিকাংশই কুচরিত্র, অপবিত্র—তবে কেউ মনে, আর কেউ দেহে। সৎ হয় সুধু অল্পাংশই। এর ভেতর থেকেও সমাজ যদি যথার্থ পুণ্য-প্রাণকে পরের দোষে ত্যাগ করে, তবে তার মঙ্গল-চেষ্টা সফল হয় কি ক'রে?"

—"আলোকনাথ, তুমি বড় সূক্ষ্মদিক দিয়ে বিচার কর্‌চ। মানুষের মনের ভিতরটা তো সমাজের নখ-দর্পণে নেই,—সে দেখ্‌তে পায় সুধু মানুষের দেহটাকে। তাই অপবিত্র দেহকে সে বর্জ্জন করে,—হয়তো অনেক সময়ে পবিত্র-চিত্তের ওপরেও অত্যাচার হয়, কিন্তু এ অত্যাচারও

না-জেনে এবং অধিকাংশের জন্যে। রাজার আইন সাধুকে রক্ষা কর্‌বার জন্যেই, কিন্তু তবু অজান্তে সময়ে সময়ে সাধু পায় শাস্তি, আর অসাধু পায় মুক্তি। তাই ব'লে কি তুমি রাজাকে আইন তুলে দিতে বল? তাতে দেশে সাধুতা বাড়্‌বে, না অসাধুতা বাড়্‌বে? আসলে এখানে ও-সব নিয়ে কথা হচ্চে না। সমাজ যে নারীর অপবিত্র দেহকে ভিতরে গ্রহণ করে না, আমার মতে, সেজন্যে তাকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তবে এখানে এই অসহায়াদের অকূলে না ভাসিয়ে, পাপ-বৃত্তি-গ্রহণে বাধ্য না ক'রে, অন্য কোনরকমে সাহায্য করা উচিত। এই, তুমি যেমন সাহায্যের চেষ্টা কর্‌চ। কারণ, পুরুষের পশুত্বে বা মুহূর্ত্তের অস্থায়ী দুর্ব্বলতায় যারা অপবিত্র হয়েচে, এমন সাহায্যে তাদের ওপরে সুবিচার করা হয়।"

—"তবে আমি সেই চেষ্টা কর্‌চি ব'লে কেন আপনি ভাব্‌চেন যে আপনাদের সমাজ এ চেষ্টাকে সুনজরে দেখ্‌বে না?"

—"কারণ এমন চেষ্টা এ দেশে নতুন। খুব স্বাধীন সমাজেও নূতনকে প্রথম দৃষ্টিতেই গ্রহণ কর্‌তে সকলে নারাজ হয়। বিশেষ এ যে আগুন নিয়ে খেলা! তার ওপরে আমাদের সমাজে সৌভাগ্যক্রমে এ-রকম পতিতার সমস্যা কখনো হয়-নি, তাই আমি জোর ক'রে ঠিক বল্‌তেও পারি না যে, তোমার এই সমস্যা-পূরণের চেষ্টাকে আমাদের সমাজ কি চক্ষে দেখ্‌বে! বুড়ো হয়েচি, সমাজের মন-পরীক্ষার বিপদজনক দায়িত্ব এ-বয়সে আর ঘাড়ে নেওয়া চলে না। শেষটা সমাজ যদি আমাকে ত্যাগ করে, তাহ'লে সে আঘাত আমি আর সইতে পার্‌ব না। আলোকনাথ, তুমি জানোনা, বার্দ্ধক্য মানুষকে কতখানি ভীরু, দুর্ব্বল, অসহায় ক'রে ফেলে! যে গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার তুমি মাথায় নিয়েচ, এ বুড়ো হাড়ে তা তো আর সইবে না বাবা! এখন আমার শান্তিতে বিশ্রাম কর্‌বার বয়স, অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর!"

আলোকনাথ আর কিছু বল্‌লে না, খানিকক্ষণ নীরবে বসে রইল। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "আচ্ছা সত্যানন্দবাবু, আর আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে চাই না। এখন আমি বিদায় হই। নমস্কার।"

—"নমস্কার। কিন্তু বাবা, মনে রেখো, এ বুড়োকে ভুলোনা, মাঝে মাঝে যেমন আসো, তেম্‌নি এসে দেখা ক'রে যেও। জেনো, আমি তোমাকে নিজের ছেলের চেয়ে কম ভালোবাসি না।"

আলোকনাথ সে ঘর থেকে বেরুতেই দেখ্‌লে, দেয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মঞ্জরী! একদিনেই তার মুখখানি বাসি-ফুলের মতন শুকিয়ে বেরঙা হয়ে গেছে, মাথার চুলগুলো উস্কখুস্কো, আর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নাম্‌ছে,—যেন দুটি পরিম্লান কমল-কোরক থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ঝ'রে ঝ'রে পড়্‌ছে।

আলোকনাথ দাঁড়াল—এক-মুহূর্ত্তের জন্যে। তার ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠ্‌ল—দুটো সম্ভাষণ কর্‌বার জন্যে। কিন্তু তখনি আত্মসংবরণ ক'রে সে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু নীচে নাম্‌তে যাবে, পিছন থেকে মঞ্জরীর ডাক শুনলে, "আলোকবাবু!"

আলোকনাথ ফিরে জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

মঞ্জরী অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, "আলোকবাবু, বাবার সঙ্গে আপনার কথা আমি সব শুনেচি। কাল না-জেনে আপনাকে অনেক অকথা-কুকথা ব'লে এসেচি, তার জন্যে আপনার কাছে আজ ক্ষমা চাইচি।"

আলোকনাথ অনেক কষ্টে বল্‌লে, "আচ্ছা", ব'লেই আবার নীচে নাম্‌বার জন্যে সিঁড়িতে পা বাড়াল।

মঞ্জরী বল্‌লে, "দাঁড়ান! জন্মের মত পালিয়ে যাবার জন্যে এত বেশী ব্যস্ত হবেন না। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব।"

—"বল।"

—"আপনি কি সত্যিই ঐ আশ্রমের সম্পর্ক ছাড়্‌তে পার্‌বেন না?"

—"না।"

—"আমার জন্তেও না?"

—"তোমার জন্তেও না, অন্ত কারুর জন্তেও না।"

—"তাহ'লে ঐ স্ত্রীলোক গুলোকে—"

—"তাচ্ছীল্য ক'রে তুমি যাঁদের 'স্ত্রীলোকগুলো' বল্‌চ, আমি তাঁদের মহিলা ব'লে শ্রদ্ধা করি।"

আলোকনাথের সংশোধন গ্রাহ্য না ক'রেই মঞ্জরী আহত স্বরে বল্‌লে, "তাহ'লে ঐ স্ত্রীলোকগুলোকে আপনি আমার চেয়েও বড় মনে করেন?"

—"ওঁদের আমি তোমার চেয়ে বড়ও ভাবিনা, ছোটও ভাবিনা। মনুষ্যত্বে ওঁরা কেউ তোমার চেয়ে কম নন।"

মঞ্জরী দৃপ্ত কণ্ঠে বল্‌লে, "আলোকবাবু! আমার সঙ্গে ওদের নাম আপনি কর্‌বেন না! জানেন, ওদের আপনি কোথা থেকে তুলে এনেচেন?"

—"বাইরের ধুলো থেকে। কারুর আত্মা বাইরের ধুলোয় লুটোয়, কারুর আত্মা মনের ধুলোয় ধূসরিত হয়। আমি বেশ জানি মঞ্জরী, ওঁদের মন ধুলো-মাটিতে ময়লা হয়নি। মনে ওঁরা তোমার মতই পবিত্র। একথা শুনে যদি রাগ কর, উপায় নেই—কিন্তু একথা সত্য।"

অস্ফুটস্বরে মঞ্জরী বল্‌লে, "আপনি যদি সত্যিই আমাকে ভালোবাস্‌তেন, তাহ'লে এত-বড় অপমানটাও কর্‌তে পার্‌তেন না, আর ওদের জন্তে এমনভাবে আমাকে ত্যাগ ক'রেও যেতেন না!"

—"তোমাকে আমি ভালোবাসি কি না বাসি, অন্তর্যামী তা জানেন।

কিন্তু স্বার্থকে কোনদিন আমি কর্ত্তব্যের ওপরে ঠাঁই দিতে শিখিনি। এটা যদি তুমি দোষ ব'লে ভাবো, তবে—কিন্তু থাক্, যখন বিদায় হয়েই যাচ্ছি, তখন আর তোমার সঙ্গে মিছেই তর্ক করা"—বলতে বলতে আলোক সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপদে নীচে নাম্‌তে লাগ্‌ল।

মঞ্জরী কাতরে মিনতি ক'রে ডাক্‌লে, "আলোকবাবু, আলোকবাবু!"

আলোকনাথ বুকের তুফানকে রোধ ক'রে সমান নেমে গেল—সে আর থাম্‌লে না, কথা কইলে না, ফিরে চাইলে না, চলন্ত পাষাণ মূর্ত্তির মত উঠান পার হয়ে সদর দরজা দিয়ে একেবারে বাইরে গিয়ে পড়্‌ল।

আবার মঞ্জরীর ক্রন্দন-ভরা কণ্ঠস্বর, বরফের দেশের তীক্ষ্ণ, শীতার্ত্ত হাওয়ার মতন তার কাণের ভিতরে গিয়ে বিঁধ্‌ল-"আলোকবাবু, আলোকবাবু!"

আচ্ছন্নের মত সে জনতা ও কোলাহল-ভরা রাজপথ দিতে চল্‌তে লাগ্‌ল,—তার মনে হোলো, যেন কোন্ বিজন মরুর-প্রান্তরের উপর দিয়ে তিমির-নিবিড় নিশীথে কে জানে কোন্ দিকে সে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করছে, আর পিছন থেকে কে যেন বারংবার করুণ মিনতি ক'রে ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে বল্‌ছে—কোথা যাও, ফিরে এস, ফিরে এস গো, এই চাঁদের আলোর মাঝে ফিরে এস, এই ফুলের রাঙা হাসিতে ফিরে এস, এই পাখীর গানের তানে ফিরে এস, এই বসন্তের চির-উচ্ছ্বাসে ফিরে এস গো প্রাণবন্ধু, চ'লে যেও না—ফিরে এস?"

কর্ত্তব্যের পথ কি এত দুর্গম, এত অন্ধকার? এই তো সবে পথের আরম্ভ, পথের মাঝে কি অন্ধকার আরো গাঢ় হবে, বুক আরো দমে যাবে, হাহাকার আরো কাতর হয়ে উঠ্‌বে? সে কি আর সঙ্গীর খোঁজ পাবে না,—তার তৃষিত প্রাণকে যে দরদী হৃদয়ের সরস ছায়ায় ঢেকে সকল ব্যথা জুড়িয়ে দেবে?

এতক্ষণ যে বাদলের মেঘ মনের ভিতরে গোপনে ধীরে ধীরে জমে উঠ্‌ছিল, এখন আর সে বাগ্‌ মান্‌লে না—আলোকনাথের চোখ দিয়ে তারই বিদ্রোহী ধারা প্রবল বেগে ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল!—কোঁচার খুঁট্‌ দিয়ে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে আলোকনাথ আবেগ-রুদ্ধ স্বরে বল্‌লে, "আমি তোমাকে ভুল্‌ব মঞ্জু, আমি তোমাকে ভুল্‌ব, তোমাকে ভুল্‌ব!"

পনেরো

কাগজওয়ালারা আজকাল একেবারে নীরব ;—হয় তারা হাঁপিয়ে পড়েছে. নয় তাদের গালাগালির ঝুলি নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাদের মুখরতায় ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে খালি অলোকনাথের নিজের। কিন্তু যে-জন্যে আলোকনাথ এই সম্পাদকীয় গালাগালিটা দীর্ঘকাল ধ'রে নির্ব্বিবাদে হজম কর্‌লে, সেই আশ্রমের অনিষ্ট তো কিছুই হয়নি, উল্‌টে বরং তার শ্রীবৃদ্ধিই হয়েছে।

মঞ্জরীকে হারিয়েছে, এইটেই সব চেয়ে তার বড় দুঃখ। তার আর যা-কিছু অনিষ্ট হয়েছে, সেগুলো সে গ্রাহ্যই কর্‌লে না। আত্মীয়দের মধ্যে যাঁরা ছিলেন অতিরিক্ত 'সাধু', কাজে-কর্ম্মে তাঁরা আলোকনাথের নিমন্ত্রণ রদ ক'রে দিলেন। বন্ধু-মহলে কোন কোন দলে সে 'লম্পট' উপাধিতে ভূষিত হোলো এবং দু-চারজন নীতিবাগীশ বন্ধুর সঙ্গে তার দেখা হ'লে তাঁরা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেতেও সুরু করলেন। আর-একদল লোক এতদিন কিছুতেই আলোকনাথের সঙ্গ ছাড়েনি,—তারা হচ্ছে ঘটকের দল। যদিও আলোকনাথ বারংবার জানিয়েছিল যে. কন্যাদায় থেকে কারুকেই উদ্ধার কর্‌তে তার মনে একটুও বাঞ্ছা নেই, তবু কিন্তু ঘটকের পাল তাকে অব্যাহতি দিতে চায়নি ; কারণ তার রূপ, গুণ ও অর্থের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে, মণ্ডা-লুব্ধ চিলের মত অনেক কনের বাপই তার উপরে ছোঁ মার্‌বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন এবং ঘটকরা নিয়মিত-রূপে আস্‌ত-যেত তাঁদেরই শুভ-ইচ্ছা বহন ক'রে। বলা বাহুল্য, আশ্রম-স্থাপনের পর থেকেই মেয়ের বাপরা আশ্চর্য্য-রকম নির্লোভ হয়ে গেলেন এবং

ঘটকদের টিকিও আর উঁকিঝুঁকি মার্‌ত না। এই ঘটকাভাবে আলোকনাথ হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

সে মনে মনে ভাব্‌লে, এরই নাম কি একঘরে বা সমাজচ্যুত হওয়া? তবে একঘরে হবার নামে লোকে ভয়ে এমন কুঁক্‌ড়ে পড়ে কেন? এ ভয় কি এতই অলীক?

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন একটি কিশোরী নিজেই এসে আলোকনাথের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লে। নিজের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস সে যা বর্ণনা কর্‌লে, তার মোদ্দা কথা এই:

তার নাম রূপসী (এবং সত্যিই সে রূপসী)। বর্দ্ধমানের এক গণ্ডগ্রামে তার শ্বশুর-বাড়ী। তার স্বামী পশ্চিমের কোন্ রাজার কাছে চাকুরি করেন। তাদের গাঁয়ের এক রূপ-সওদাগরের সুনজর পড়ে রূপসীর উপরে। একজন লোকের দ্বারা গোপনে সে রূপসীর কাছে কুপ্রস্তাব ক'রে পাঠায় ও অনেক লোভ দেখায়। রূপসী কিন্তু নারাজ হয়। তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলায় রূপসী পুকুর-ঘাটে জল তুল্‌তে গেছে, হঠাৎ জনকতক লোক তাকে ধ'রে চুরি ক'রে নিয়ে যায় এবং কি খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে তাকে একেবারে কল্‌কাতায় চালান করে। কল্‌কাতায় আজ ছয়মাস রূপসীকে একটা কুস্থানে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে একখানা বাঙ্‌লা খবরের কাগজ তার হাতে গিয়ে পড়ে। তাতে আশ্রমের ঠিকানা আর অনেক নিন্দা ছিল এবং সেই কাগজখানি প'ড়েই রূপসী এই আশ্রমের কথা ও উদ্দেশ্য প্রথমে জান্‌তে পারে। আজ্‌কে হঠাৎ সুযোগ পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে, একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে সে আশ্রমে এসে হাজির হয়েছে।

সমস্ত শুনে আলোকনাথ বল্‌লে, "আমরা তো খোঁজখবর না নিয়ে আশ্রমে কারুকে রাখি না!"

রূপসী ঘোম্‌টার ভিতর থেকে কাঁদো-কাঁদো গলায় বল্‌লে, "আপনি কি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন? তবে আমি কোথায় যাব?" বল্‌তে বল্‌তেই সে কেঁদে ফেল্‌লে।

তার অসহায়তার কান্না আলোকের মনকে ভিজিয়ে তুললে। কোমল-স্বরে বল্‌লে, "আচ্ছা, আপাতত তুমি এখানেই থাকো। তারপর খোঁজ-খবর নিয়ে যদি উচিত মনে করি, তবে তোমাকে এখানেই রাখ্‌ব।"

পরদিন দুপুর-বেলায় রাধারাণী এসে বল্‌লে, "আলোকবাবু, আপনি রূপসীর খোঁজখবর নিতে লোক পাঠিয়েছেন কি?"

আলোকনাথ বল্‌লে, "না, এখনো পাঠাইনি।"

—"শীগ্‌গির খোঁজ নিন।"

—"কেন?"

—"আমার কেমন সন্দেহ হচ্চে!"

—"সন্দেহ! কিসের সন্দেহ?"

—"রূপসী নিজের কথা যা বলেচে, তা হয়তো সত্যি নয়।"

—"সে কি! তাও কি হয়!"

—"তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তেই তার স্বামীর নাম বল্‌লে।"

—"তাতে কি হয়েচে?"

—"বাঙালী গৃহস্থের মেয়ে স্বামীর নাম মুখে আনে না।"

—"কিন্তু আজকাল অনেক লেখাপড়া-জানা মেয়ে ও কুসংস্কার তো মানে না! তুমি মিছেই সন্দেহ কর্‌চ রাধারাণী!"

—"হ্যাঁ, লেখাপড়া-জানা নব্য হিন্দুর সহুরে মেয়ে হ'লে আমিও এটা আমোলে আনতুম না। কিন্তু রূপসী একে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার ওপরে এখনো তার বর্ণ-পরিচয়ই হয়নি।"

—"বল কি রাধারাণী!"

—"হ্যাঁ, আজ তাকে একখানা বই পড়্‌তে দিলুম, কিন্তু সে পড়্‌তে পারলে না!"

—"অথচ আমাকে সে বল্‌লে, খবরের কাগজে আশ্রমের কথা প'ড়েই এখানে এসেচে।"

—"মিছে কথা বলেচে!"

—"তাতে তার লাভ?"

—"ভগবান জানেন! রূপসীর হাতের 'নোয়া' দেখে মনে হোলো, সে 'নোয়া'গাছা যেন সদ্য সদ্য কিনে এনে পরা হয়েচে। তার মাথাতেও বাঁকা সিঁথে, পাড়াগাঁয়ে ভদ্র মেয়েদের ভেতরে এখনো বাঁকা সিঁথের চলন হয়েচে ব'লে শুনিনি।"

—"রূপসীকে তুমি কি বল্‌তে চাও?"

—"ওর হাব-ভাব, কথা কইবার ধরণও ভালো নয়। আমার তো মনে হয়, ও কুলটা!"

আলোকনাথ চম্‌কে উঠ্‌ল!

রাধারাণী বল্‌লে "নিশ্চয়ই ওর স্বামী নেই—কোনকালে বিয়েই হয়েচে কি না, সন্দেহ! ও যা পরিচয় দিয়েছে, তাও আর মিথ্যে না হয়ে যায় না!"

—"তাতে ওর লাভ? আশ্রমে এসে করবে কি?"

—"কে জানে! কি ফন্দীতে যে ও এখানে মরতে এসেচে, কিছুই তো বুঝতে পারচি না! হয় তো কোন শত্রু আশ্রমের নাম খারাপ করবার জন্যে ওকে এখানে পাঠিয়েচে।"

আলোকনাথ চিন্তিত মুখে চুপ ক'রে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

রাধারাণী বল্‌লে, "আপনি খোঁজ নিতে আর একটুও দেরি করবেন না।"

—"আজ্‌কেই লোক পাঠাব। যতক্ষণ না খবর পাই, ততক্ষণ ওকে

বুঝ্‌তে দিও না যে, আমরা কোন সন্দেহ করেচি। ও যদি সত্যিই ভদ্রঘরের মেয়ে হয়, তবে আমাদের সন্দেহ ওর বুকে বড় বাজ্‌বে। কারুর মনেই কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়।"

—"আচ্ছা, ওকে কিছুই জান্‌তে দেব না। আমি কিন্তু লিখে দিতে পারি, রূপসী গেরস্ত'র মেয়ে নয়।"

—"তাইত, আমাকে যে বড়ই ভাবিয়ে দিলে তুমি। আচ্ছা, মুস্কিল যাহোক্।" এই ব'লে আলোক তখনি জামা-কাপড় প'রে বাইরে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু এ মুস্কিলটা যে কতখানি সাংঘাতিক, আলোকনাথ সে কথা ভালো ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌লে পরের দিন সকালবেলায়, যখন দারোয়ান এসে খবর দিলে, "দুজন পুলিসের লোক জনকতক পাহারাওয়ালা নিয়ে বাবুর খোঁজ কর্‌চে!"

আলোকনাথ একটু অবাক্ হয়ে নীচে নেমে গেল। গিয়ে দেখ্‌লে, ইন্‌স্পেক্টরের পোষাক-পরা একটি লোক, একজন জমাদারের সঙ্গে একেবারে বাগান পেরিয়ে বাড়ীর দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তাদের পিছনেই কয়েকজন লাল-পাগড়ী।

ইন্‌স্পেক্টর আলোককে দেখেই সুধোলে, "আপনার নাম কি আলোকনাথ রায়?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তাহ'লে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার কর্‌লুম। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে!"

সদ্য-আকাশচ্যুতের মত মুখের ভাব ক'রে আলোকনাথ বল্‌লে, "আমাকে গ্রেপ্তার কর্‌বেন! আমার নামে ওয়ারেণ্ট! কেন?"

—"আপনি রূপসী ব'লে একটি নাবালিকা মেয়েকে তার মায়ের কাছ থেকে চুরি ক'রে এনে আট্‌কে রেখেচেন।"

আলোকনাথের মুখখানা সাদা হয়ে গেল মড়ার মত। রূপসী—রূপসী —এই জন্যেই রূপসী এসেছে!

ইন্‌স্পেক্টর তার সে ভাবটা তীক্ষ্ণচক্ষে লক্ষ্য করছিল। একটু মুরুব্বিআনা চালে মাথা নেড়ে মুখ টিপে হেসে বল্‌লে, "আলোকবাবু দেখ্‌চি বড়ই ভয় পেয়েচেন। কিন্তু এখন আর ভয় পাওয়া মিছে! যখন পরের বাগানের ফুলের ওপরে লোভ করেছিলেন, তখনি আপনার ভাবা উচিত ছিল যে, সব বাগানই পোড়ো-বাগান নয়, কোন কোন বাগানে মালিও আছে, মালিকও আছে।"

আলোকনাথ ভ্রূসঙ্কোচ ক'রে অসন্তুষ্টস্বরে বল্‌লে, "মশাই, আপনার অভদ্রতা দেখে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি।"

—"আপনিও যে বিশেষ ভদ্র, আপনার কাজ দেখে তো তা মনে হচ্চে না। আপনি বেশ্যার মেয়ে চুরি ক'রে এনে আট্‌কে রেখেচেন।"

আলোকনাথ গর্জ্জন ক'রে বল্‌লে, "মিথ্যে কথা! কে আপনি এখানে এসেচে!"

—"তাহ'লে আপনি মান্‌চেন যে, রূপসী এখানে আছে?"

—"কেন মান্‌ব না, আমি তো তাকে জোর ক'রে ধ'রে বা লুকিয়ে রাখিনি! এখানে আস্‌বার আগে আমি তাকে কস্মিন্‌কালে চোখেও দেখিনি, চিন্‌তুমও না।"

—"মশাই, আপনার এ গাঁজাখুরি কথায় আদালত্ বিশ্বাস কর্‌বে না। যার সঙ্গে কখনো আপনার চেনাশুনো নেই, স্ত্রীলোক হয়েও সে এত জায়গা থাক্‌তে তার বাবুকে, মাকে ছেড়ে, আপনার কাছে পালিয়ে আস্‌বে কেন? এমন বোকার মতন কথা কইবেন না।"

—"হ্যাঁ, আমার কথা বোকার মতন শোনাচ্চে বটে,—কিন্তু এইটেই

সত্য কথা।" এই ব'লে রূপসীর এখানে আসার বিবরণ দু-চার কথায় সে বর্ণন করলে।

ইন্‌স্পেক্টর আবার অবিশ্বাসের বাঁকা হাসি হেসে বললে, "মশাই, এটি আপনার রচা রূপকথা। রূপসীর এমন মিথ্যে পরিচয় দিয়ে এখানে এসে থাকবার উদ্দেশ্য কি?"

—"নিশ্চয় আমার কোন শত্রু আমাকে বিপদে ফেলবার জন্যে, রূপসীকে অর্থলোভ দেখিয়ে এখানে পাঠিয়েচে।"

—"আপনার এমন শত্রু কে?"

—"কি ক'রে বলব? সব মানুষেরই শত্রু থাকে—কেউ গুপ্ত, কেউ ব্যক্ত। গুপ্ত শত্রুর নাম করা যায় না।"

—"কে আপনার শত্রু, আর সে যে সত্যিই আপনাকে বিপদে ফেলতে এই চক্রান্ত করেচে, এ-সব প্রমাণ করতে না পারলে আদালতে আপনার কোন কথাই টিকবে না। যাক্‌গে, ওসব আপনি যা ভালো বোঝেন পরে করবেন, আপাতত আমার কর্ত্তব্য আমি করি।"

—"আপনি কি করতে চান?"

—"আপনাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাব। রূপসীকেও চাই।"

আলোক তখনি একজন দ্বারবানকে বাগানের অন্য কোণে, আশ্রম-বাড়ীতে রূপসীকে আনবার জন্যে পাঠিয়ে দিলে।

রূপসী যখন এল, তখন সে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। এখন আর তার মুখে ঘোমটাও নেই। অশ্রুসিক্ত চোখে, সকাতর অনুনয়ে সে আলোকনাথকে বললে, "ওগো, আমাকে আর ধরে রেখোনা গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও,—আমি মায়ের কাছে যাই!"

আলোকনাথ তো একেবারে হতভম্ব!

ইন্‌স্পেক্টর এগিয়ে এসে রূপসীর হাত ধ'রে বললে, "তোমার আর

কোন ভয় নেই, আমরা পুলিসের লোক, তোমাকে তোমার মায়ের কাছেই নিয়ে যেতে এসেচি। তোমার নাম কি রূপসী,—তুমি কি রূপোগাছির মুক্তকেশীর মেয়ে?"

রূপসী ঘাড় নেড়ে বল্লে, "হ্যাঁ।"

—"তোমার বয়স কত?"

—"পনেরো।"

—"তুমি কি নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেচ?"

—"না, ঐ মিন্সে আমাকে জোর ক'রে ধ'রে এনেচে"—এই ব'লে রূপসী আঙুল দিয়ে আলোকনাথকে দেখিয়ে দিলে।

—"কি ক'রে নিয়ে এল?"

—"হপ্তায় তিনদিন আমি এক বাবুর কাছে 'বাঁধা' আছি, আর চারদিন 'ছুটো' লোক আসে। ঐ মিন্সে একদিন আমার ঘরে গিয়েছিল। আমাকে কথায় কথায় বল্লে, 'ট্যাক্সিতে চড়ে বেড়াতে যাবে?' আমি তখনি রাজি হয়ে গেলুম। সেদিন আমারও যেমন পোড়া-কপাল, মরতে চারটে সিদ্দির-কুলপী খেয়েছিলুম। ট্যাক্সিতে চ'ড়ে গায়ে ফুরফুরে হাওয়া লাগতেই কেমন বেভুল হয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। ওমা, জেগে উঠে দেখি, ঐ হাড়-হাবাতে মিন্সে আমাকে এই বাগান-বাড়ীতে এনে, একটা ঘরে পূরে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে। আজ তিনদিন আমাকে ঘর থেকে এক-পা বেরুতে দেয়নি মশাই, আমি কান্নাকাটি করাতে মেরে আমার গত চূর্ণ ক'রে দিয়েচে। এই দেখ বাবু, মারের দাগ!"

আলোকনাথ অবাক হয়ে দেখলে, রূপসী অম্লানমুখে, অসঙ্কোচে আপনার বুকের ও পিঠের কাপড় সকলের সাম্‌নেই খুলে ফেল্লে। সত্যি-সত্যিই তার বুকের উপরে একটা এবং পিঠের উপরে দুটো বড় বড় কালশিরের দাগ ছিল! এ দাগ কোথা থেকে এল? তাকে জব্দ

কর্‌বার জন্যে রূপসী কি নিজেই নিজের দেহকে এমনভাবে আহত করতেও ভয় পায়নি? একে বালিকা বললেও চলে, কিন্তু পাপপথে থেকে এই বয়সেই কি নারী এতদূর ভয়ানক হ'তে পারে?

ইন্‌স্পেক্টর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দাগগুলো পরীক্ষা করতে লাগ্‌ল, কিন্তু আলোকনাথ একবার দেখেই তখনি মাথা হেঁট ক'রে ফেল্‌লে—ভয়ে বা আর কোন কারণে নয়,—নারীত্বের এই শরীরী নির্লজ্জ অপমানের দিকে সে আর চোখ তুলে চাইতেই পার্‌লে না,—এ যে স্বপ্নাতীত!......... অমন সুন্দর মুখ, অমন পূরন্ত যৌবন-শ্রী, অমন সরল হাব-ভাব,—তার মধ্যে এত পাপ, এত কপটতা!—বিধাতার সৃষ্টি এমন ব্যর্থ! ফুলের কুঁড়িতে গোখ্‌রোর ছানা!

ইন্‌স্পেক্টর বল্‌লে, "মশাই, শুনেচি আপনি কি-এক আশ্রম করেচেন, সে আশ্রমে রূপসীর মত বেচারী আরো ক-জন আছে?"

আলোকনাথ বিরক্ত কণ্ঠে বল্‌লে, "আশ্রমের কথায় আপনার কোন প্রয়োজন নেই, আপনি যা করতে এসেচেন, তাই করুন।"

ইন্‌স্পেক্টর ক্ষাপ্পা হয়ে বল্‌লে, "কী! আবার তেজ! লোহার বালা না পর্‌লে মেজাজ ঠাণ্ডা হবে না বুঝি? শুকমলাল, রাস্কেলের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দে তো!"

রাস্কেল! আলোকনাথের মেজাজ দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল! চোখ না পাল্‌টাতে তার মুষ্টিযুদ্ধে-দুরন্ত হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ইন্‌স্পেক্টরের চোয়ালের উপরে ঠিক সেই জায়গাটিতে বজ্রের মত গিয়ে পড়্‌ল, যেখানে ঘুসি লাগ্‌লে মানুষ এক পলকেই অজ্ঞান হয়ে যায়! ইন্‌স্পেক্টর ঘুরে মাটির উপরে ঠিক্‌রে গিয়ে পড়্‌ল,—জমাদার ছুটে এল, তারও সেই দশা হ'তে বিলম্ব হোলো না।

পাহারাওয়ালারাও হৈ-চৈ ক'রে ডাণ্ডা ঘুরিয়ে আক্রমণের উদ্যোগ

কর্‌ছে, এমনসময়ে আলোকনাথের দ্বারবানেরা সবাই দৌড়ে এল। কিন্তু আলোকনাথের ইঙ্গিতে তারা দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। তারা সবাই কুস্তিগীর—লম্বা-চওড়া জোয়ান। আলোকনাথের একটি বাতিক ছিল—মাথায় ছ'ফুটের চেয়ে কম-লম্বা দ্বারবান রাখ্‌ত না। তাদের চেহারা দেখেই লালপাগ্‌ড়ীদের মন থেকে সরকারি নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌বার আগ্রহ নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

খানিক পরে ইন্‌স্পেক্টরের জ্ঞান হোলো। উঠে বসে দু-হাতে চোখ কচ্‌লে একবার চারিদিকটা দেখে নিলে। বুঝ্‌লে, ব্যাপার বড় সঙিন্‌। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে, আস্তে আস্তে বল্‌লে, "আলোকবাবু, তাহ'লে আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত নন ?"

আলোকনাথ বল্‌লে, "কে বল্‌লে প্রস্তুত নই! দেখ্‌তেই পাচ্চেন, আমি পালাতে পার্‌তুম—কিন্তু পালাই নি।"

—"তাহ'লে এ-সব কি ?"

—"এই দরোয়ানের কথা বল্‌চেন ? ভয় নেই—ওদের আমি কিছু কর্‌তে মানা ক'রে দিয়েচি! আমি ওদের ডাকিও-নি, গোলমাল দেখে ওরা আপনি এসেচে। আপনাদের এই ক'টা লোককে মার্‌তে আমি দরোয়ান ডাক্‌তে যাব কেন, মনে কর্‌লে আমি এক্‌লাই আপনাদের লম্ফঝম্প থামিয়ে দিতে পারি। আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ভাব্‌চেন আমি বাজে বড়াই কর্‌চি ?"—আলোকনাথের পাশেই একটি হৃষ্টপুষ্ট ভারি-চেহারার পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়েছিল, আচম্বিতে তার কোটের কলারটা ধ'রে একহাতেই সে তাকে ছেলে-খেলার পুতুলের মতন অনায়াসেই মাটি থেকে প্রায় দেড়-হাত উঁচুতে টেনে তুলে ফেল্‌লে!

শূন্যে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে পাহারাওয়ালাটি অত্যন্ত অসহায়ভাবে বিড়ালের মুখে ইঁদুরের মত হাত-পা ছুঁড়্‌তে লাগ্‌ল।

—"এখন কি আমার কথায় বিশ্বাস হচ্চে ?"—এই ব'লে আলোকনাথ পাহারাওয়ালার দেহটিকে শূন্যে বার-কতক দুলিয়ে ছেড়ে দিলে—সে হাত-চারেক তফাতে মাটির উপরে গিয়ে ধুপ্ ক'রে পড়্‌ল।

পুলিসের উপস্থিত লোকগুলির সকলেই বিপুল বিস্ময়ে প্রকাণ্ড হাঁ ক'রে থ হয়ে রইল—মানুষের গায়ে এত জোর! আলোকনাথের হাতের কাছে আরো যে-দুজন পাহারাওয়ালা ছিল, তারা গুটিগুটি নিরাপদ ব্যবধানে স'রে গিয়ে দাঁড়াল—পাছে তাদেরও নিয়ে সে আবার কোন নতুন কেরামতি দেখিয়ে দেয়, এই ভয়ে!

ইন্‌স্পেক্টর, জমাদারের কাণে কাণে বল্‌লে, "ওহে, গতিক বড় সুবিধের ঠেক্‌চে না, এখন মিষ্টি কথায় কাজ হাঁসিল কর্‌তে না পার্‌লে, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরুনোই শক্ত হয়ে উঠবে! একা রামেই রক্ষে নেই—তার ওপরে দরোয়ানগুলোর চেহারা দেখচ তো ?"

আলোকনাথ বল্‌লে, "পুলিসে ঢুক্‌লেই ভদ্রলোকের ছেলে যে কেন ভদ্রতা ভুলে যান, আমি তা বুঝ্‌তে পারি না। আপনি যদি আমাকে গালাগাল না দিতেন, তাহ'লে তো এ-সব কোন গোলমালই হোতো না!"

ইন্‌স্পেক্টর কাঁচুমাচু মুখে বল্‌লে, "ও-কথা যেতে দিন মশাই, আমি মান্‌চি, আমার অন্যায় হয়েচে!"

আলোকনাথ বল্‌লে, "এখন আপনি আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে চলুন,—আপনার কর্ত্তব্যে আমি আর বাধা দেব না। কিন্তু হাতকড়িটা কি নিতান্তই পর্‌তে হবে ?"

ইন্‌স্পেক্টর বল্‌লে, "আপনি যখন নিজেই সঙ্গে যেতে চাচ্ছেন, তখন আপনার হাতে না-হয় ওটা আর নাইই পরানুম!"

ষোলো

তারপর মাসখানেক কেটে গেছে।

রাধারাণী আর মুকুলমালা বিষণ্ণ-ভাবে ব'সে আছে—তাদের দুজনেরই চোখে-মুখে গভীর ভাবনা ও বেদনার আভাস।

রাধারাণী খাম ছিঁড়ে একখানি চিঠি বার ক'রে আস্তে আস্তে মৃদুস্বরে পড়্‌তে লাগ্‌ল। এ হচ্ছে আলোকনাথের পত্র :—

"প্রিয় রাধারাণী, বোন মুকুল,

তোমাদের দুজনেরই কাছ থেকে দু-বৎসরের ছুটি নিলুম। কারণ এই চিঠি পড়বার আগেই তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ যে, আমার প্রতি দু-বৎসর সশ্রম কারাবাসের হুকুম হয়েছে।

এই হোলো দুনিয়ার সুবিচার! পৃথিবীর বড় বড় মগজ থেকে হাজার হাজার আইনের কেতাব বেরিয়েছে; তাদের মহিমায় ঢের ঢের চোর-ডাকাত-খুনে প্রতিপক্ষের উকিল-ব্যারিষ্টারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিত্যই কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং আমার মত অনেক নিরপরাধ হতভাগ্যই আপনাদের নির্দ্দোষিতা কিছুতেই প্রমাণিত করতে পারছে না।

জগতের ভগবানও সুবিচারক নন। পাপাত্মা যে, কেন সে মোহরের বিছানায় শুয়ে দেশ ও দশের মান্য হয়ে পরম আরামে নিশ্চিন্ত জীবন কাটিয়ে দেয়? পুণ্যবান যে, কেন সে চিন্তাভারে অবসন্ন, অন্নাভাবে জীর্ণশীর্ণ হয়ে পথের ধূলায় অবহেলায় অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করে? থুথ্‌ড়ো বুড়ো কেন কাণা-খোঁড়া, কালা-বোবা বা কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে বেঁচে থাকে? আর সংসারের আশা-ভরসা যারা, জাতির শিরোভূষণ যারা, বাণী ও প্রতিভার বরপুত্র যারা, সকলকে কাঁদিয়ে কেনই বা তারা সবল

যৌবনের পূর্ণ-জাগরণের সময়েই আচম্বিতে অনন্ত নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে? শাস্ত্রী এ প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে, বাচালের মুখ-বন্ধের জন্যে টিকি দুলিয়ে গর্জ্জে বলেন—"পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফল!" পূর্ব্বজন্মের প্রমাণ কই?—মানুষের লেখা শাস্ত্রের ধোঁয়া-ধোঁয়া বচন? আমি মানি না। অনেক পণ্ডিত বলেন, "মানুষী ভাবের দ্বারা মানুষ ভগবানকে গড়ে তুলেছে।" তাই কি মানুষের মতন ভগবানও অবিচারক? কিংবা ভগবানের বিশ্বব্যাপী অবিচার ও পক্ষপাতিতা দেখে, মানুষও তারই অনুকরণ করতে শিখেছে? যাক্-গে, ভগবানের অস্তিত্ব নিয়েই আমার মনের সন্দেহ যখন ঘোচেনি, তখন ভগবানের কথা নিয়ে আমি আর বেশী নাড়া চাড়া করতে চাই না।

আমার দু-বৎসর কারাবাসের হুকুম হয়েছে, এতে কিন্তু আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই!

তোমরা কি বড় বেশী দুঃখিত হয়েছ? সম্ভব! প্রথমটা দুঃখ আমারও বড় কম হয়নি। ভরা-যৌবনের জোয়ার আমার বুকের মধ্যে নেচে নেচে উথলে উঠছে—এ বয়সে মানুষের কত আশা! দেশের ও দশের মাঝে নাম কিনবে, সকলের শ্রদ্ধার ফুল পায়ের তলায় এসে পড়বে, জগতে অমরতা অর্জ্জণ করবে!

কিন্তু নিয়তির এক ফুৎকারে আশার দীপ নিবে যায়। আজ আমি কি? সমাজ-তাড়িত, জাতির ঘৃণিত, রাজদণ্ডে শাসিত, লাম্পট্যে কলুষিত এক অধম অপরাধী,—পিতৃপুরুষের নাম ডুবিয়ে চোর-ডাকাত-খুনীর সঙ্গে উঠতে-বসতে-শুতে চলেছি!

দুঃখ না-হওয়াই বিচিত্র!……প্রথম ধাক্কাটা প্রাণে বড় বিষম বেজেছিল। যে মুখ থেকে নির্দ্দোষীর উপরে এক কঠিন শাস্তির হুকুম বেরুল, সেই দিকে চেয়ে দেখলুম! ক্রোধের দমকা ঝড়ে বুকখানা দুগুণ ফুলে উঠল। মনের মধ্যে এক পাগল ইচ্ছার সাড়া পেলুম। ঐবে দম্ভে-

গর্ব্বে স্ফীত, নির্ম্মল গাম্ভীর্য্যের মুখোসে আবৃত, পাথরের মত স্থির মুখখানা বিচারকের পবিত্র উচ্চাসনকে কলঙ্কিত করছে, একটি লম্ফে তার উপরে গিয়ে প'ড়ে, প্রচণ্ড এক মুষ্ট্যাঘাতে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ধূলোর মতন চারিদিকে উড়িয়ে দেবার জন্তে হাত-দুখানা আমার নিসপিস্ করতে লাগ্ল! তা পারতুমও বোধহয়। আমার দেহে যে শক্তি আছে, তাতে দু-দশজনের বাধা আমার সে আকস্মিক বজ্র-গতিকে কিছুতেই বাধা দিতে পারত না—বেশী লোক এসে পড়্বার আগেই ঝড়ের মতন শীঘ্র আমি আমার ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে ফেল্‌তুম! কিন্তু সে ইচ্ছা আমি দমন করেছি। বিচারককে আমি মুক্তি দিলুম,—যদিও নির্দ্দোষীকে তিনি রেহাই দিলেন না!

তারপরেই দেখলুম, আর এক দৃশ্য! কারাবাসের হুকুম পাবার পরেই দেখি, দর্শকদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল—কে বল দেখি?—যুগল-কিশোর! তার পশু-মুখখানা দানবী হাসিতে প্রদীপ্ত! যেন সে বড়ই পরিতৃপ্ত! হাস্‌তে হাস্‌তে সে রূপসীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল—তারপর নরত্ব ও নারীত্বের এই সেরা নমুনাদুটি পরস্পরের হাত-ধরাধরি ক'রে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল—হয়ত নতুন শিকারের খোঁজে। এতদিন আদালতে যুগলকিশোরের দেখা পাইনি—আজ কিন্তু রূপসীর সঙ্গে তাকে দেখে মনের ভিতরে একটা সন্দেহের বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌ল। আমার যত অনিষ্টের মূল, ঐ যুগলকিশোর নয়তো? রূপসী হয়তো পুতুল-খেলার পুতুল—আড়াল থেকে ঐ যুগলকিশোরেরই হাত হয়তো তাকে স্বেচ্ছামত খেলিয়েছে!—ঠিক, ঠিক, কোন সন্দেহ নেই! যুগল-কিশোর মুকুলকেও মেরেছে—আমাকেও মার্‌লে। তখন সকল রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল, বেশ বুঝলুম, কোন্ শত্রু আমার পিছনে এমন ক'রে লেগেছে! কাঠগড়াটা প্রাণপণে দু-হাত দিয়ে চেপে ধ'রে দুরন্ত রাগের আর-একটা ঝট্‌কা কোন রকমে সাম্‌লে নিলুম।

মানুষ ক্রমেই দেবত্বের দিকে, উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে না? কেতাবী পণ্ডিতদের কথা শুনলে দৃঢ়বিশ্বাস হয়—স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী হওয়া এখন একটা কথার কথা মাত্র! কিন্তু পৃথিবীতে সত্যিই কি পশুত্ব কমেছে এবং দেবত্ব বেড়েছে? তাহ'লে আমাদের ঐ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যি, অতি-বৈষ্ণব থাকোহরিবাবু, যুগলকিশোর, রূপসী আর রাধারাণীর সেই পরম দয়ালু আত্মীয়,—এরা কোন্ শ্রেণীর জীব? পৃথিবীতে কি এখন এই শ্রেণীর জীবকে কম দেখা যায়? না! এরাই ক্রমে দলে ভারি হচ্ছে! একালের 'উন্নত সভ্যতা' যে মুখোস আবিষ্কার করেছে,—তাইতেই মুখ ঢেকে থাকে ব'লে এখনকার বৃহত্তর পশুত্ব সহজে ধরা প'ড়ে যায় না। সেকেলে পশুদের মুখোস ছিল না—বেচারীদের নাম তাই একটা প্রবাদ হয়ে পড়েছে।

পশুত্বে আমরা সেকালকে টক্কর দিয়েছি—কিন্তু নীচু হয়ে প'ড়েছি বিদ্যায়, চারিত্র্যে, প্রতিভায়, মানবতায়! শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট, মহম্মদ, কালিদাস, সেক্স্‌পিয়ার, ব্যাস-বাল্মিকী-হোমার—এ মহামানবরা সেকালকেই শ্রেষ্ঠ ক'রে রেখেছেন। এমন-কি, সভ্যতার উন্নততর পরিবর্ত্তিত ধারায়, সেদিনকার নেপোলিয়নও আর বোধ হয় নূতন রূপে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন না। একের মধ্যে তখন বিকশিত প্রতিভার যে বিপুলতা দেখা যেত, এখন তা বহুর মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ে ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। এতে যে জন-সাধারণের উপকার হয়েছে, তাই-বা কি-ক'রে বলি? হিন্দু-যুগে, গ্রীক যুগে, রোম্যান-যুগে কলা-শিল্প-জ্ঞান-চর্চ্চার দিকে জনসাধারণের যে গভীর, সার্ব্বত্রিক অনুরাগ দেখা যেত, আধুনিক জনসাধারণ কি তার চেয়েও বেশী রসিকতা ও ভাবুকতার পরিচয় দিতে পেরেছে?

হাঁ, একালের বিজ্ঞান নিজের বিভাগে সেকালকে একেবারে ক্ষুদ্র ক'রে দিয়েছে বটে! কিন্তু উচ্চতর মানবতায় আধুনিক বিজ্ঞান তো মানুষকে

এক ইঞ্চিও উঁচু করতে পারেনি! মানুষ কিসে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, বিলাসে-আলস্যে কাল কাটাবে, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে কণ্টক হ'লে কি করে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ হরণ করবে—বিজ্ঞানের সকল চেষ্টা তাইতেই অবসিত হচ্ছে। তুমি কল টিপে আলো জ্বালবে, পাখা চালাবে, ভাত-রাঁধবে, এক পা না চ'লে সিঁড়ি দিয়ে নামবে, পা ব্যথা না ক'রে ট্রামে-ট্রামে-মোটরে চ'ড়ে বেড়িয়ে আস্‌বে, কয়েক ঘণ্টাতেই ভারত থেকে য়ুরোপে সংবাদ-প্রেরণ করবে, উড়োজাহাজে চ'ড়ে ধরাকে সরা দেখ্‌বে, ডুবোজাহাজে পাতালে গিয়ে ঢুকবে এবং 'জ্যাক্-জনসনে' নগর-কে-নগর উড়িয়ে দেবে!—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এতে হোলো কি! মানুষের পশুত্ব কম্‌ল, না বাড়্‌ল? বুদ্ধদেব, সেক্‌স্‌পিয়র ও সেকেন্দর এ-সবের নামও কখনো শোনেননি। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্য পেয়েও কি একালের পল্লবগ্রাহী জ্ঞানী, মাসিক পত্রের কবি আর পাঞ্জাবের জেনারেল ডায়ার জ্ঞানে-কবিত্বে-বীরত্বে তাঁদের চেয়ে উচ্চ-স্তরে উঠ্‌তে পেরেছেন?

না, একালের উপরে আমার ঘৃণা ধরেছে। একালের নামে এই বিজয়-দুন্দুভি বাজানোতে আমার আপত্তি আছে। আমার বিশ্বাস, একালের এই আত্মগোপন-পরায়ণ, সভ্য পশুগুলোকে দেখ্‌লেও, আদিম-কালের সেই সরল, অসভ্য পশুত্ব ঘৃণা-লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে যেত। মানুষ এখন আর বন-মানুষ নয়,—নগর-মানুষ। এবং বন-মানুষের চেয়ে নগর-মানুষ ঢের-বেশী নিকৃষ্ট জীব।.

বিজ্ঞানের মহিমায় পৃথিবীর নব-ঘন শ্যাম-শ্রী কল-কারখানার হাজার হাজার চিম্‌নীর ধোঁয়ায় ক্রমেই অধিক মলিন হয়ে উঠ্‌ছে! এই-সব কল কারখানার ভিতরে ঢুকলে আমার মন একেবারে এলিয়ে পড়ে। এক-একটা মেঘচুম্বী প্রকাণ্ড কারখানা, আদিম কালের ভীষণ দানবের মত, পৃথিবীর বুকে মস্ত-বড় কালো ছায়া ফেলে, আকাশে মাথা তুলে যেন

মানুষ-শিকারের আশায় ওৎ পেতে ব'সে আছে, আর ক্রমাগত গর্জ্জে হুস্ হুস্ ক'রে ধোঁয়ার নিশ্বাস ছাড়ছে! তাদের আকারের অনুপাতে মানুষগুলোকে পিপড়ের মত ছোট ও নগণ্য দেখায় এবং মনে হয়, যেন এই মানুষের জন্যেই কারখানা নয়, কারখানার জন্যেই মানুষের সৃষ্টি! ক্ষুদ্র মানুষগুলো পিল্ পিল্ ক'রে কারখানার জঠরে গিয়ে ঢুকছে আর ঢুকছে! ভিতরকার যন্ত্রগুলো দেখলে বোধ হয়, এগুলো যেন কারখানা-দানবের অস্থি-কঙ্কাল! যেমন বিপুল, তেমনি ভীষণ! সেই-সব যন্ত্র ক্রমাগত উঠছে, নামছে, ঘুরছে-ফিরছে—তাদের আওয়াজ কানে গেলে বসন্তের পাখী দখিন হাওয়ার রাগিণী ভুলে যায়! তাদের আনাচে-কানাচে আশে-পাশে দলে দলে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে,—'কি করছ' জিজ্ঞাসা করলে বলবে 'যন্ত্র চালাচ্চি'! কিন্তু তারা যন্ত্র চালাচ্ছে, না যন্ত্রই তাদের ধ'রে চালাচ্ছে? যন্ত্রের এই বিপুল দাসত্বে নিযুক্ত থেকে তারা নিজেরাও যে দিনে দিনে কলের পুতুল হয়ে পড়ছে, সে দিকে কারুরই খেয়াল নেই! প্রাণ থেকে তাদের রস্-কস্ কবিত্ব, মনুষ্যত্ব, আত্মজ্ঞান, স্বাধীন চিন্তাশক্তি ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে,—মানবতার এই শোচনীয় অপব্যবহার দেখলে আমার চোখ ফেটে জল পড়ে! হায়, পৃথিবীতে বন-ভূমির নীলিমা ক্রমেই মুছে আসছে এবং তার স্থান অধিকার করছে হাড়গোড় ভাঙা দ-য়ের মত ঐ কুৎসিত, বিশাল, নরহত্যাকারী কল-কারখানাগুলো! কলাবিদ আর কার জন্যে কবিতা লিখবেন, গান গাইবেন, ছবি আঁকবেন? শঙ্কর আর কার জন্যে ধর্ম্মপ্রচার করবেন, খৃষ্ট আর কার জন্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন, চৈতন্য আর কার জন্যে প্রেম বিলিয়ে ভাবাবেশে নেচে বেড়াবেন? তা শুনবে কে, বুঝবে কে, দেখবে কে? বিজ্ঞান যে মানুষকে 'আধুনিক' করেছে, কারখানা যে তার মনুষ্যত্ব হরণ করেছে! মানুষ উন্নত হয়েছে? মিথ্যাকথা! সে পশুরও অধম। পশুর স্বাধীনতাও তার নেই।

এক-একবার তাই সাধ হয়, ছুটে যাই এই ইট-কাঠ-ধূলো, এই মটর-ট্রাম-ট্রেণ, এই সংসার-সমাজ-কোলাহল ছেড়ে, ভুলে, পিছনে ফেলে—প্রকৃতির উদার, বিস্তৃত কোলে! যেখানে সাগর অসীমের বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে দিগন্ত ব্যেপে অনন্ত নৃত্য-লীলায় মেতে আছে, যেখানে আকাশের নীল-বিছানায় চাঁদের পাহারায় জোছনা গা এলিয়ে ঘুমিয়ে আছে, যেখানে উদয়-তোরণে প্রভাতসূর্য্যের বিপুল জাগরণোৎসব চল্‌ছে, পাখী গাইছে, নদীর জল-বীণা বাজ্‌ছে, ফুল-ফোটা গাছে গাছে শাখায় শাখায় কোমল-সবুজ পাতায় পাতায় মর্ম্মর-কাহিনী জেগে উঠ্‌ছে! তরুণ তৃণ-শয্যায় শয়ন, নির্ঝরের শীতল ধারায় স্নান, যথেচ্ছ বনফল ভক্ষণ, ছায়া-করা কানন-পথে, ধূ-ধূ-ধূ প্রান্তরে, মেঘ-জড়ানো গিরির শিখরে শিখরে ভ্রমণ—সে জীবন কি শান্ত, কি স্বাধীন, কি পবিত্র! "সমাজ-সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব" কবি ঠিক বলেছেন। তার চেয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো, উল্কার মত গতির আনন্দে বিশ্বভুবনে হেসে-নেচে-মেতে বেড়াও, হৃদয়কে আকাশে বাতাসে যত খুসি ছড়িয়ে দাও!.........

রাধারাণী, মুকুলমালা, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। বন্দী হয়ে অন্ধ কারাগারে ঢোক্‌বার আগে প্রাণের আবেগকে একবার স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দিয়ে পার্‌লুম না—পত্রও তাই দীর্ঘ হয়ে উঠ্‌ছে। এ বাহুল্যকে তোমরা মার্জ্জনা কোরো। আমাকে তো আজ আর কেউ বুঝ্‌বে না, তোমরাই খালি আমার বুকের ভিতরটা দেখেছ, তাই তোমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ ক'রে একটুখানি সহানুভূতি চাইছি!

আমার এই কারাদণ্ডে বোধ হয় আর দুজন লোক দুঃখ পেয়েছেন। বিচারে কি হয়, জান্‌বার আগ্রহে তাঁরাও আদালতে এসেছিলেন। [illegible]ম যখন হুকুম দিলেন, তখন দেখ্‌লুম, মঞ্জরী (মঞ্জরীকে তোমরা দেখেছ তো?), আর মঞ্জরীর পিতা সত্যানন্দবাবু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁদের দুজনেরই চোখ দিয়ে তখন ঝর্-ঝর্ ক'রে জল পড়্ছে! তাঁদের চোখে অশ্রু দেখে আমার কি আনন্দ হোলো! এই নিষ্করুণ বিচারালয়ের মধ্যে আমার দুঃখে কাঁদ্তে পারে, অন্তত এমন দুটি আত্মাও তাহ'লে আছে! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্তে কাঁদ্তে, বাপের কাঁধে মাথা রেখে মঞ্জরী ধীরে ধীরে এলমেলো পায়ে বেরিয়ে গেল, আদালতসুদ্ধ লোক অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

এখন আর বল্তে দোষ নেই যে, এই মঞ্জরীর সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু পাছে আশ্রমের সম্পর্ক ছাড়্তে হয়, সেই ভয়ে তাকে আমি বিবাহ করিনি। ভাগ্যে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবার আগেই আমার বিবাহ হয়ে যায়নি! তাহ'লে আজ আমার এই দুর্ভাগ্যে লজ্জায়, দুঃখে অপমানে, লোকসমাজে মুখ দেখাতে না পেরে মঞ্জরী নিশ্চয়ই প্রাণে বাঁচ্ত না। আমাকে বিবাহ করলে মঞ্জরী কখনোই সুখী হ'তে পার্ত না। এত-বড় ভুল যে ক'রে ফেলিনি, এও এক পরম সান্ত্বনা।

আগেই বলেছি যে, কারাবাসের হুকুম পেয়ে প্রথমটা আমারও খুব দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু সে দুঃখ এখন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেছে। এখন মনে হচ্ছে, এই দুঃখই আমাদের কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা বাড়াবে। জগতে সমস্ত সফলতার মূল্যই সমান নয়। বিনা-বাধায় যে সফল হয়, তার আর গৌরব কি? সে রকম সফল তো সবাই হ'তে পারে! কিন্তু যে পথে বাধা-বিঘ্ন অগুন্তি, দুর্গম ব'লে যেখানে পথিক চলে না, সেই পথে যে সফলতা অর্জ্জন করতে পারে, সেই-ই তো যথার্থ সাধক, গৌরব তো তারই প্রাপ্য! এই যে আজ আমি দুঃখ পেলুম, বাধা পেলুম, এতেও যদি আমি পৃষ্ঠভঙ্গ না দিই, তবেই তো লোকে বুঝ্বে, আমি কমল-বিলাসী ভীরু-কপট নই,—সাধকের লক্ষণ আমার চরিত্রে আছে!

অতএব এই দুঃখ-অপমানকে আমি মাথায় তুলে নিলুম। যাদের জন্যে

আজ আমি এই দুর্ভাগ্যের বুক-ভাঙা আঘাত পেলুম, তাদের উপরে আর আমার কোনই রাগ বা আক্রোশ নেই। আমি এই বিচারককে ক্ষমা কর্‌লুম, যুগলকিশোরকে ক্ষমা কর্‌লুম, রূপসীকে ক্ষমা কর্‌লুম! এদের জন্যে কাজে আমার সফলতা দুর্লভ হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু প্রাণপণ সাধনায় এই দুর্লভকে যেদিন লাভ কর্‌ব—সেদিন আমার যথার্থ-ই গৌরবের দিন!

আর, আমার মতে, প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই মাঝে মাঝে বিফল হওয়া ভালো। দৈবের বা অন্য-কারুর কৃপায় মানুষ যখন সব কাজে অল্পেই সফল হয়, তখন প্রচণ্ড গর্ব্বে বিশ্বকে সে যেন নস্যাৎ ক'রে দিতে চায়। বিফলতা তার সেই আত্মম্ভরিতাকে আহত করে, তাকে কাণে ধ'রে বুঝিয়ে দেয় যে, সে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান নয়—সামান্য মানুষ-মাত্র; কর্ত্তব্যকে কঠোর সাধনার মত না দেখে অবহেলা কর্‌লে এম্‌নি ভাবেই জাঁক্ ভেঙে যায়। মাঝে মাঝে বিফল হওয়া এবং বাধা পাওয়া ভালো।

আমার জন্যে তোমরা দুঃখিত বা নিজেদের জন্যে ভাবিত হোয়ো না। আমার অবর্ত্তমানে তোমাদের কোনই ভয় নেই। আমি এই দুর্ভাগ্যের জন্যে প্রস্তুত ছিলুম,—তোমাদের সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থাই ক'রে এসেছি। আমার দেওয়ানবাবু ও পুরানো দ্বারবান মহাদেও পাঁড়ে থাক্‌তে তোমাদের কিছুই অসুবিধা হবে না। দেওয়ান-বাবু আমার বিশ্বাসী লোক এবং সাধুচরিত্র। আর মহাদেও পাঁড়ে নামেই দ্বারবান্, আসলে সে আমার বড় ভাইয়ের মত। কারণ তার কোলেই আমার শৈশব ও কৈশোর নিরাপদে কেটেছে। তোমাদের যা-কিছু দরকার হবে, এই দুজনের কাছে অসঙ্কোচে জানিও,—তোমাদের জন্যে এঁরা প্রাণ দিতেও পিছ্‌পাও হবেন না।

ব্যায়ামাগার আর আশ্রমের কোন অনিষ্ট হ'লে, আমার এই কারা

াসের যন্ত্রণাও ব্যর্থ হয়ে যাবে। তোমরা নারী, কারাগারের সঙ্গে তোমাদের কিছুই যোগ নেই। তাই দেওয়ানবাবু আর মহাদেও পাড়ের উপরে তার সব ভার দিয়ে এসেছি। কিন্তু আশ্রমের ভালো-মন্দ তোমাদের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কর্ছে। এটা তোমরা ভুল্বে না জানি,—তবু মনে করিয়ে দিলুম। যেমন চল্‌ছে, আশ্রমের কাজ ঠিক সেই পদ্ধতিতেই চলুক্‌—একটুও যেন এদিক-ওদিক না হয়। বাঙালার কাজ সাধারণতঃ একজনের উপরে নির্ভর করে এবং সেই একজনের মৃত্যুতে বা অভাবে প্রায়ই সে অনুষ্ঠান নিষ্ফল হয়ে যায়। "দেবীর আশ্রম" যাতে কারুর মুখাপেক্ষী না হয়, গোড়া থেকেই আমি ঠিক সেইদিকেই চোখ রেখে সমস্ত ব্যবস্থা করেছি। তবু আশ্রমের সবে এই শৈশব কিনা, এখন তোমরা যত্ন না নিলে সে বাঁচ্‌বে কেমন ক'রে? মনে রেখ, আমার দেহ কারাগারে শৃঙ্খলিত হয়ে থাক্‌লেও, আমার সমগ্র প্রাণ-মন প'ড়ে রইল তোমাদের সঙ্গেই,—আশ্রমের প্রত্যেক কর্ত্তব্যে! গিয়ে যেন দেখি, আশ্রমের লক্ষ্মীশ্রী বেড়েছে বই, কমেনি। আমার এই আশ্রম-স্থাপন, মস্ত একটা পরীক্ষা। আমাদের বিমুখ সমাজকে আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাই,—যোগ্যকে বর্জ্জন না কর্‌লে, অনিচ্ছাকৃত বা মুহূর্ত্তের পাপে যারা 'পতিতা', যারা নির্দ্দোষী বা পরিণাম দেখবার আগেই অনুতপ্তা, তাদের প্রতি নরকে নির্ব্বাসন-দণ্ড না দিলে, তারা মানুষের কত কাজে লাগে এবং নারীত্বের মর্য্যাদা কতখানি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পারে!

রাধারাণী, মুকুলমালা,—দু-বৎসরের জন্যে বিদায়! কিন্তু তৃতীয় বৎসরের প্রথম সূর্য্যোদয়ে আবার আমার সাড়া পাবে—আমি মরব না!"

—আলোক।

দ্বিতীয় ভাগ

এক

মুক্তি, মুক্তি,—দুই বৎসরের পর প্রথম মুক্তি!

স্বাধীনতার আস্বাদ যে কত মধুর, অধীন না হ'লে আলোকনাথ বোধ হয় এমন ক'রে কখনো তা বুঝতে পারত না।

গিরি-গুহার ভিতর থেকে নির্ঝরের ধারা ঝরছে—অবিরাম, কিন্তু সংকীর্ণ। গুহার মুখ বন্ধ ক'রে দাও। অন্ধকার গুহার মধ্যে নির্ঝর নিশি-দিন কেঁদে-কেঁদে মরবে। 'ফুলে' ফুলে,' চারিদিকে পথ হাতড়ে, মাথা কুটে, ছট্‌ফট্‌ ক'রে পাহাড়ের কঠিন বুকে সে ফাটল ধরাতে চাইবে। কিছুদিন পরে ফের গুহার মুখ খুলে দেওয়া হোক। নির্ঝরের শীর্ণ-সংকীর্ণ ধারা তখন বিপুলপ্রপাতে পরিণত হয়ে, বজ্র-রবে হুড়্‌হুড়্‌ ক'রে বাইরে বেরিয়ে পড়্‌বে—প্রচণ্ড আনন্দে সলিল-মূর্তি ধূমকেতুর মত! যে ধারা একদিন ছোট তৃণকেও ব্যথা দিত না, এখন তারই জল-বাহুর ধাক্কায় পাথরের দুই-কূল ধ্বসে-ভেঙে ভেসে যাবে—তাকে নিবারণ করে, এমন সাধ্য কারুর থাক্‌বে না।

আলোকনাথের অবস্থাও হোলো আজ ঠিক সেই রকম। এতদিন তার যে গতি, যে দৃষ্টি জেলখানার উঁচু পাঁচিলে লেগে আহত হয়ে কেঁদে-কেঁদে ফিরে আস্‌ত, তাদের সুমুখ থেকে চকিতে আজ সকল বাধা দূরে স'রে গেল,—আবার তারা স্বাধীন, আবার তারা অনাহত! এ আনন্দ কি রাখ্‌বার ঠাঁই আছে? আজ তার মনে হোলো, ইচ্ছা করলে সে যেন ঐ অসীম আকাশকে এখনি মুঠোর ভিতরে পূরে ফেল্‌তে পারে, বিশ্বচারী

সমগ্র বাতাসকে এক-নিশ্বাসে বুকের মাঝে টেনে নিতে পারে, প্রভাত সূর্য্যের ঐ কনক-রশ্মিমালাকে এক-মুহূর্ত্তে দৃষ্টি দিয়ে পান করতে পারে!

আলো-ভরা পৃথিবীর বুকে, খোলা হাওয়ায় নীলাকাশের তলায় আবা স্বাধীন অকুণ্ঠ ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আলোকনাথ বল্লে, 'আজ আমি যথার্থই অমৃতের অধিকারী!' সত্য-সত্যই হাঁ ক'রে সে খোলা বাতাসকে কণ্ঠ ভ'রে গ্রহণ করতে লাগ্ল—খালি নিশ্বাস দিয়ে টেনে তার সাধ যে মিট্‌তে চাইছিল না! এমন বাতাস কতদিন তার দেহের ভিতর ঢোকে নি! সারা-রাতের ঘুম থেকে জেগে উঠে, মানুষ যেমন তার আলস্য শিথিল দেহটাকে আগে একবার ছড়িয়ে নিতে চায়, তেম্‌নি ক'রে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে দু-চারবার হাত-পা ছুঁড়্‌লে, আড়্‌মোড়া ভে নিলে। তারপরে বারকতক শিশুর মতন মনের খুসিতে দৌড়াদৌড়ি ও লাফালাফি না ক'রে তার যেন তৃপ্তি হোলো না!

পিছনেই জেলখানার উঁচু পাঁচিল,—শত শত আত্মার অবিরা আর্ত্তনাদকে ভিতরে পূরে অটল হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে আলোকনাথের মন যেন ব'লে উঠ্‌ল—"সরে যা, স'রে যা, অসাড় ইটে নির্দ্দয় গাঁথুনি, চোখের সাম্‌নে থেকে মুছে যা, লুপ্ত হয়ে যা—তোর ওপ আকাশের হাজার বাজ্ ভেঙে পড়ুক্! মানুষের ধড়্ থেকে মুণ্ড ছিঁ নিয়ে তুই তাকে প্রাণে মারিস্ না বটে, কিন্তু যে গতি মানুষের জীবন, তা সেই অবাধ-গতির লীলা তুই বন্ধ ক'রে দিস্, জড় কলের পুতুলের ম মানুষকে তুই অন্ধকারে ফেলে রাখিস্! এখনি ভূমিকম্প হোক্, পাতা তোকে গ্রাস করুক্!" আলোকনাথ এই ভেবে অবাক হোলো যে এর ভিতর থেকে একবার বেরিয়েও যারা ফের চুরি-জোচ্চুরি করতে ডরায় না, না-জানি তারা কেমন লোক!

জেলখানার দরজায় যে পাহারাওয়ালাটা দাঁড়িয়েছিল, স্থির-চক্ষে ে

আলোকনাথের ভাব-ভঙ্গি নিরীক্ষণ করছিল।—অধীনস্থার এই অন্যতম রক্ষকটিকে দেখে আলোকনাথের প্রাণটা অস্বস্তিতে ভ'রে উঠ্‌ল! তার চোখ এড়িয়ে স'রে যাবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি কয় পা এগিয়ে গেল,—হঠাৎ তার কাণে একটি চেনা স্বর এসে ঢুক্‌ল—"আলোকবাবু!"

আলোকনাথ চম্‌কে চেয়ে দেখ্‌লে, একখানি মটর-গাড়ী এসে তার সাম্‌নেই থেমে পড়্‌ল এবং গাড়ীর ভিতরে বসে রয়েছে রাধারাণী!

গাড়ীখানা থাম্‌তে না-থাম্‌তেই চালকের পাশ থেকে এক লাফে নীচে নাম্‌ল, মহাদেও পাঁড়ে। সে একেবারে আলোকনাথকে দু-হাতে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আবেগে অবরুদ্ধ স্বরে ডাক্‌লে, "বাবুজী, বাবুজী!"—

রাধারাণী আলোকনাথের চেহারা দেখে আকুল কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল, "আলোকবাবু, আলোকবাবু, আপনার দেহ এ কি হয়ে গেছে! দেখ্‌লে যে সে-মানুষ ব'লে আর চেনাই যায় না!"

আলোকনাথ শুক্‌নো হাসি হেসে বল্‌লে, "তবু তো তোমরা দেখ্‌বামাত্র আমাকে চিনে ফেল্‌লে রাধারাণী! এবার থেকে আত্মীয়-বন্ধুদের কারুর সঙ্গে দেখা হ'লে বোধ করি, তাঁরা আর চিন্‌বেন না, কথাও কইবেন না—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে স'রে পড়্‌বেন! আমি যে এখন লম্পট মানুষ, চোর, ডাকাত-খুনে'র স্যাঙাত্‌!"

বাস্তবিক, আলোকনাথের চেহারা একেবারে বদ্‌লে গেছে। ছেলেবেলা থেকে সে ব্যায়াম-প্রিয়,—চিরকালটা খোলা-হাওয়ায় দৌড়ঝাঁপ ক'রে স্বাধীন-স্ফূর্ত্তিতে বেড়ে উঠেছে। এমন-কি শেত-শুভ্র-দুরন্ত মুক্ত আকাশের তলায়,—ঘরের ভিতরে নয়। জেলখানার অন্ধ কোটর আর উঁচু পাঁচিল তার সেই সবল, উচ্ছ্বসিত, স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ-চাঞ্চল্যকে যেন দম বন্ধ ক'রে চেপে মেরেছিল—প্রতি-পদক্ষেপেই সে যেন শৃঙ্খলের শব্দ কাণে শুন্‌তে পেত ও শিউরে শিউরে উঠ্‌ত! জলের জীব ডাঙায় এলে

তার যে হাল হয়, আলোকনাথের অবস্থাও হয়েছিল অনেকটা সেই রকম!

রাধারাণী বেদনাবিদীর্ণ স্বরে বল্লে, "আলোকবাবু, আপনার কি অসুখ হয়েচে?"

আলোকনাথ বল্লে, "দেখে বুঝ্‌তেই পার্‌চ তো! আজ ক-মাস ঘুষ্‌ঘুষে জ্বরে ভুগ্‌চি, জেলের ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে খেয়ে মুখ তেঁতো হয়ে গেছে, তবুও তো সার্‌ল না! সিদ্ধ পাতা-ডাঁটা, তেঁতুল-গোলা, রেঙ্গুন-চাল আর 'লপ্‌সী' খেয়ে কি মানুষ বাঁচে? নিতান্ত জেলখানায় মর্‌ব না ব'লে দৃঢ়-পণ ক'রে বসেছিলুম, যমদূত বোধ হয় তাই বিশেষ সুবিধা কর্‌তে পারেনি! কিন্তু বল দেখি, তোমরা কি ক'রে ঠিক্ সময়ে এখানে এসে হাজির হ'লে?"

রাধারাণী বল্লে, "আমরা যে দিনের পর দিন গুণ্‌ছিলুম! তার ওপরে মহাদেও এসে খবর নিয়ে গেছে।"

আলোকনাথ অভিভূত কণ্ঠে বল্লে, "তাহ'লে তোমরা আমাকে ভোলোনি! অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল যখন ভাবতুম, আমার কিন্তু তখন মনে হোতো, এই পাঁচিল-ঘেরা অন্ধকারের বাইরে যে রবি-শশীর আলো-ভরা মস্ত-বড় জগৎ আছে, সেখানে আমার কথা আর কারুর মনে নেই! এই সব ভাবতুম আর কাঁদ্‌তুম, যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাতে পার্‌তুম না!"

রাধারাণী ধরা-ধরা গলায়, মাটির উপরে চোখ রেখে বল্লে, "আলোকবাবু, আমাদের জন্যেই আজ আপনার এই দশা, আর আমরা আপনাকে ভুল্‌ব!······রাত্তিরে ঘুমিয়েও যে আমার স্বস্তি ছিল না, স্বপ্নেও যে আপনাকেই——" কথা শেষ না ক'রেই সে থেমে পড়্‌ল, তারপর কি-এক লজ্জায় তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে!

আলোকনাথ একটু আশ্চর্য্য হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর বল্‌লে, "কিন্তু তুমি কেমন আছ, সে কথা তো এখনো জিজ্ঞাসা করা হয়নি!—মুকুলমালা?—আমার আশ্রমের খবর কি?"

রাধারাণী বল্‌লে, "আমরা সবাই ভালো। আশ্রমও বেশ চল্‌চে।"

—"আর মহাদেও! তুইও ভালো আছিস্ তো ভাই!"

মহাদেও এতক্ষণ আলোকনাথের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে অত্যন্ত রেগে, চোখ পাকিয়ে জেলখানার দরজার পাহারাওয়ালাটার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল। তার মনে হচ্ছিল, আলোকের দেহ যে এত রোগা আর কাহিল হয়ে পড়েছে, এজন্যে ঐ ব্যাটা লালপাগড়ীটাই একমাত্র দায়ী! আলোকনাথের কুশল-প্রশ্নের উত্তরে সে বল্‌লে, "ভালো আছি দাদা, ভালো আছি!"

রাধারাণী বল্‌লে, "আর কতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন?"

আলোকনাথ বল্‌লে, "কতকাল রাস্তায় পা দিইনি, রাস্তা ভারি ভালো লাগ্‌চে। মনে হচ্চে, এইখানেই শুয়ে প'ড়ে একদৃষ্টিতে প্রাণ ভ'রে ঐ আকাশ-পানে চেয়ে থাকি!"

—"আর পাগল ব'লে আবার আপনাকে গারদে নিয়ে যাক,—কেমন, আপনি এই চান্ তো? আসুন, আসুন—দেখ্‌চেন না, পথের লোকগুলো কি রকম হাঁ ক'রে চেয়ে আছে? নিন্, গাড়ীতে উঠুন!"

—"কাজেই। গারদে যাবার ভয় যখন দেখালে, তখন বাড়ীতে যাওয়াই ভালো। আয় মহাদেও!"—

মহাদেও এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ল যে, এবার পূজো-পার্ব্বনের সময়ে পাড়ার ঘাঁটির পাহারাওয়ালা যখন বখ্‌সিস্ চাইতে আস্‌বে, তখন বখ্‌সিস্ না দিয়ে তার পিঠে সে তিন পয়জার বসিয়ে দেবেই দেবে—এতে জেলে যেতে হয়, সেও ভি আচ্ছা। ও সব 'শ শুরা'ই

সমান বদ্‌মাস্‌,' খোকাবাবুর শরীর রোগা ক'রে দেয়—এত বড় 'বাৎ' ! আচ্ছা, আচ্ছা. ত্নদিন সবুর কর, মালুম হবে !

বাগানের ভিতরে ঢুকে বাড়ীর দরজায় গিয়ে গাড়ী দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই মুকুলমালা পাগলের মতন ছুটে এসে আলোকনাথের পায়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। চাপা-গলায় একেবারে কেঁদে ফেলে বল্‌লে, "দাদা, দাদা, দাদা !"

—"ছিঃ, পায়ে পড়্‌তে নেই—ওঠো বোন, ওঠো !"—ব'লে আলোকনাথ হাত ধ'রে তাকে টেনে তুল্‌লে।

আলোকনাথের চেহারা দেখে মুকুলমালাও শিউরে উঠল ! সে কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু আলোকনাথ বাধা দিয়ে বল্‌লে—"ব্যাস্‌ ! শিউরে উঠেচ তো, তাহ'লেই হোলো—আমার চেহারার কথা আর নয়। ও-কথা একবার হয়ে গেছে, আর পুনরুক্তি শুনে মন খারাপ করতে চাই না ! এখন এস, আশ্রমটা একবার দেখে আসি !"

মুকুলমালা বল্‌লে, "সে কি আলোদাদা, না জিরিয়েই ?"

—"ত্ন-বৎসর ধ'রে জেলে ব'সে এত জিরিয়েচি যে, এখন ত্ন-বৎসর আর না জিরুলেও হেসে খেলে চ'লে যাবে ! জিরিয়ে জিরিয়ে দেখ্‌চ না, আমার হাড়ে ঘুণ ধ'রে দেহ মাটি ক'রে দিয়েচে !"

—"জেলে তো লোকে ঘানি টানে, পাথর ভাঙে !"

—"না, সবাইকে নয়। আমি পেয়েছিলুম এক কালি-কলমের কাজ —যে কাজকে আমি সব-চেয়ে ঘৃণা করি, যে কাজ ক'রে ক'রে বাঙালী জাত্‌কে-জাত্‌ কুঁড়ের বাদ্‌সা হয়ে পড়েচে, জাহান্নমে যেতে বসেচে ! এর চেয়ে যদি সত্যিই ঘানি টানতে আর পাথর ভাঙ্‌তে হোতো, তবে আমি

থাকৃতুম ভালো। আমি হচ্চি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া—এমন ক'রে বসিয়ে রাখ্‌লে শরীর টেক্‌বে কেন! নাচ্‌ব, লাফাব, ছুটব—হাঁ, তাকেই বলি জীবন! এস তোমরা, আমাকে আশ্রম দেখিয়ে আনো!"

কিন্তু বাগান পার হ'য়ে আশ্রমে আর যেতে হোলো না—এরি মধ্যে আলোকনাথের আসার খবর সেখানে রটে গিয়েছিল, আশ্রমের নারীরা সবাই তখনি তাকে দেখবার জন্যে নিজেরাই এসে হাজির হলেন। দু-চারজন তার পায়ের ধূলো নিতে আস্‌তেই আলোকনাথ তাড়াতাড়ি স'রে গিয়ে, দু-হাত দিয়ে পা আগ্‌লে ব্যস্তভাবে ব'লে উঠল,—"না, না, আপনারা যদি এমন সব কুকাণ্ড করেন, তাহ'লে আমি এখান পালাব! পায়ের ধূলো নেওয়া কি, এ আমি মোটেই পছন্দ করি না! সমাজ আপনাদের মানুষের পায়ের ধূলো ক'রে রেখেছে ব'লে আপনারাও যেন নিজেদের ছোট ব'লে ভাব্‌বেন না! মানুষ হয়ে মানুষের পায়ে হাত,—এ হচ্চে দাসত্বের লক্ষণ! পায়ের ধূলো যে নেয়, তারও মন ছোট হয়ে যায়, যে দেয়, তারও মহাপাপ হয়। ধূলোর ওপরে আপনারা পদাঘাত ক'রে চ'লে যাবেন—তা সে মনের ধূলোই হোক, আর পৃথিবীর ধূলোই হোক্!"

আলোক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আশ্রমের প্রত্যেক মেয়েটিকে দেখ্‌লে। রাধারাণী যে তার কথামত কাজ করেছে, এদের প্রত্যেকেরই দেহে তার ছাপ্ স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে। আলোকনাথের মত, ছিল, মুক্ত আলো-বায়ু, ব্যায়ামচর্চ্চা আর নিয়মিত জীবন মানুষের দেহকে আদর্শ দেহ ক'রে তোলে। এই নারীগুলি তারই সাক্ষী। দু-বৎসরের আলো, হাওয়া, ব্যায়াম আর নিয়মিত জীবন এদের সকলেরই গঠন এমন ভাবে তৈরি ক'রে তুলেছে, ভাব-ভঙ্গীতে এমন একটি অকুণ্ঠ মোহন-শ্রী দিয়েছে, অঙ্গ-সঞ্চালনে এমন সুন্দর কবিতার ছন্দ সঞ্চার করেছে যে, একবার দেখ্‌লে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে দুঃখ হয়। ভাস্কর যেমন ক'রে নিজের হাতে-গড়া মূর্ত্তির

দোষ-গুণ নিরীক্ষণ ক'রে, তেম্‌নি চোখে মেয়েগুলির সর্ব্বাঙ্গে সে আপনার দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিতে লাগ্‌ল।

তারপর মনের পরখ। মানুষের দেহ আর মন, দুয়েরই সমান বিকাশ দরকার,—এদের একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির উন্নতি অসম্ভব। কারণ দেহকে মনের অসুখ আর দেহের অসুখ মনকে একই ভাবে অভিভূত করে। আলোক প্রত্যেক নারীকে ডেকে নানারকম প্রশ্ন কর্‌তে লাগ্‌ল; এবং উত্তর শুনে বেশ বুঝ্‌লে, বিদুষী রাধারাণীর শিক্ষার গুণে এই দু-বৎসরেই তাদের মন যতটা সম্ভব পরিপূর্ণ হয়ে গড়ে উঠেছে,—মনের সেই মার্জ্জিত সৌন্দর্য্য এদের মুখের কথায় আর চোখের দৃষ্টিতে ক্ষণে ক্ষণে যেন বাইরে উপ্‌চে পড়্‌ছে!

সব-শেষে তাদের হাতের কারুকার্য্য দেখা হোলো এবং আলোকনাথ তাতেও কোন খুঁৎ দেখ্‌তে পেলে না।

বাস্তবিক, দু-বৎসর আগে আশ্রমের এই নারীগুলির অবস্থা যা ছিল, এখন তা চেষ্টা ক'রেও মনে আনা যায় না। তখন কোথায় ছিল এই নিখুঁৎ গঠন-সৌন্দর্য্য, মার্জ্জিত মনের ঐশ্বর্য্য, কোথায় ছিল এই সপ্রতিভ, সুকৌশলী ভাষা, সবল ভাব-ভঙ্গি, গতিচঞ্চল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ!......... বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে কুসংস্কারের বিষাক্ত ওষুধ খাইয়ে, নারীত্বকে এম্‌নি ভাবেই ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে—মনুষ্যত্বের এমন মূল্যবান উপাদান অপচয় কর্‌তে কারুর প্রাণ কি একবারও কেঁদে ওঠে না? ইচ্ছা কর্‌লে বাঙালীর মেয়ে কেমন তিলোত্তমা হ'তে পারে, এই তো হাতে হাতে তার জ্বলন্ত প্রমাণ!

রুণ্ঠস্বরে প্রশংসা ভ'রে আলোকনাথ বল্‌লে, "রাধারাণী, তুমি নারীরত্ন! তোমার জন্যেই আজ আমার এই আশ্রম সার্থক হোলো!"

রাধারাণী লজ্জিত ভাবে বল্‌লে, "অমন কথা বল্‌বেন না আলোকবাবু!

এত-বড় গর্ব্ব কর্‌বার অধিকার আমার নেই। কল কিছু তৈরি করে না, তৈরি করে মানুষের হাত। আমি তো আপনার হাতের যন্ত্রের মত কাজ করেচি—যতটুকু শিখিয়েচেন, তার বেশী এক পা চল্‌বার শক্তিও আমার নেই যে!”

—“বিনয় সুন্দর ক’রে তোলে শক্তিকে, অতএব তোমার এই বিনয়ের প্রতিবাদ কর্‌তে চাই না! রাধারাণী, আশ্রমে এখন মেয়ের সংখ্যা কত?”

—“চৌষট্টি জন। সংখ্যা আরো বাড়্‌ত, কিন্তু আপনার অবর্ত্তমানে আমি বেশী মেয়ে আন্‌তে ভরসা পাই-নি।”

—“শিক্ষয়িত্রী ক-জন আছেন?”

—“সাতাশ জন।”

—“এঁদের হাতের কাজ বাজারে বিক্রী কর্‌বার ব্যবস্থা হয়েচে?”

—“হ্যাঁ। বিক্রীও হচ্চে বেশ।”

—“শুনে সুখী হলুম। আমি দেখাতে চাই, সমাজ কি-সব অমূল্য-রত্নে বঞ্চিত হয়েচে! সমাজের আদেশ তো এঁদের পবিত্র মনকে কলঙ্কিত কর্‌তে পারেনি, এঁদের প্রতি অবিচারের পাপে সমাজ যে নিজেই ‘কলঙ্কী’ নাম কিনেচে! ভবিষ্যতে এমন দিনও আস্‌বে রাধারাণী, যেদিন এঁদের ত্যাগ করেচে ব’লে এঁদের স্বামী আর আত্মীয়-স্বজন আক্ষেপ রাখ্‌বার জায়গা পাবে না!”

রাধারাণী বিভোর স্বরে বল্‌লে, “সেদিন পর্য্যন্ত যেন বেঁচে থাকি।”

আলোকনাথ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্‌লে, “আশ্রম তো মোটামুটি দেখা হোলো একরকম। এখন আমার ব্যায়ামাগারের ভাইগুলি কি কর্‌চেন, সেটা দেখে আস্‌তে পার্‌লে ভালো হোতো।”

মুকুলমালা রেগে চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, “ঢের হয়েচে ভালো দাদা, থাক্। তোমার ব্যায়ামাগার তো পাঞ্জাব মেল নয় যে, এখুনি না গেলে আর তাকে

পাওয়া যাবে না! ভেতরে চল। ওগো বোনেরা সব, তোমরা আপাতত আশ্রমের দিকে পিঠ্ টান দাও, নৈলে আমার পাগ্‌লা-দাদাটিকে আর সাম্‌লানো দায় হয়ে উঠ্‌বে!"

... ...

দুপুর-বেলাটা ঘুমে কাটিয়ে বিকালের মুখে আলোকনাথ জেগে উঠ্‌ল। বিছানায় ব'সে ব'সে নিজের ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লে, এই দু-বৎসরে কোথাও কিছুমাত্র অদল-বদল হয়নি—এমন কি, যে জিনিসটি যেখানে রেখে গিয়েছিল, সেটি ঠিক সেইখানেই ঝাড়া-পোঁছা প'রিষ্কার-ঝক্‌ঝকে হয়ে সাজানো রয়েছে, আল্‌নার তলায় জুতোগুলি পর্য্যন্ত! এর মধ্যে দুটি মমতা-কাতর নারী-প্রাণের যে স্নেহ-যত্নের আভাস পাওয়া গেল, আলোক তা মনে-প্রাণে অনুভব কর্‌লে।

এদিকের দেওয়ালে আলোকের একখানি প্রমাণ তৈল-চিত্র টাঙানো, তার তলায় একটি মার্ব্বেলের শুভ্র ব্রাকেট। আলোক দেখ্‌লে, সেই ব্রাকেটের উপরে কতকগুলি ফুল রয়েছে।

এমন সময়ে জল-খাবারের থালা নিয়ে মুকুলমালা এসে ঘরে ঢুক্‌ল। থালাখানি আলোকের সাম্‌নে রেখে সে বল্‌লে,"দিদি তৈরি ক'রে দিলেন।"

থালায় খানকতক পল্‌তার বড়া, গুটিকতক আঙুর, বেদনার দানা, কারিকরি ক'রে কাটা কিছু কিছু ফল আর দুটি মিষ্টি।

আলোকনাথ বল্‌লে, "দু-বৎসরের ক্ষিদে আমার পেটে চোঁ-চোঁ কর্‌চে, আর এই ক'টি জিনিস তোমার দিদি পাঠিয়ে দিয়েচেন! আমি কি ক্ষুদে-পিঁপড়ে? যাও, যাও, আরো নিয়ে এস।"

মুকুল বল্‌লে, "আর দিলে তো আনব! ঐ কি সহজে দিতে চান, আমি তবু ব'লে-করে কিছু বেশী ক'রে আন্‌লুম। দিদি বল্‌লেন, তোমার ঘুন্‌ঘুসে জ্বর হচ্চে, বেশী খেলে অসুখ বাড়্‌বে।"

এই স্নেহের অত্যাচারের উপরে আলোক আর কোন কথা কইতে পারলে না। খাবারের থালার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, "মুকুল, আমার ছবির তলায় 'ব্রাকেটে'র ওপরে গোটাকতক ফুল প'ড়ে রয়েছে কেন?"

—"তা জানো না বুঝি?···না বাপু, বলব না, দিদি যদি রাগ করেন।"

—"না বললে কিন্তু তোমার দাদা রাগ করবেন।"

—"আচ্ছা বলচি, কিন্তু দিদি যেন জানতে না পারেন। দিদি যে রোজ তোমার ছবিকে ফুল দিয়ে পূজো করেন!"

—"ছবিকে—আমার ছবিকে পূজো? সে কি, কেন?"

—"বলেন, তুমি দেবতা।"

আলোকনাথ মাথা নামিয়ে, নীরব গম্ভীর-মুখে জলখাবার খেতে লাগল। খানিক পরে একটু ইতস্তত ক'রে বললে, "দেওয়ান বাবুকে আমি ব'লে গিয়েছিলুম, তোমার স্বামীর খোঁজ নিতে। খোঁজ কিছু পেয়েচ?"

মুকুলমালার বালিকার মত নিশ্চিন্ত হাসি-খুসি-ভরা সরল ভাব বদলে গেল, পরিম্লান মুখে, করুণ স্বরে "না" ব'লেই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে তখনি সে অদৃশ্য হোলো।

আলোকনাথ বেশ বুঝলে, মুকুলের প্রাণের ক্ষত এখনো তরুণ আছে, মুখের হাসি তার ঘোমটা মাত্র—একটু বাতাসেই তা উড়ে যায় এবং লুকানো প্রাণকে জাহির ক'রে দেয়। তার মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠল, কিন্তু কি করবে, উপায় যে নেই!

আস্তে আস্তে উঠে, জামা-কাপড় প'রে সে ব্যায়ামাগার পর্য্যবেক্ষণ করতে বেরিয়ে গেল।

দিন-দুয়েক যেতে-না-যেতেই আলোকনাথের আবার জ্বর হোলো। ডাক্তার এসে বললেন, "খালি ওষুধে এ জ্বর সারবে না, 'চেঞ্জে' যেতে হবে।"

রাধারাণী বললে, "আলোকবাবু, আপনার শরীর দেখে আমার বড়

ভয় হচ্চে। আপনাকে হাওয়া বদ্‌লাতে যেতে হবে। সেবা-শুশ্রূষার জন্যে আমাদের সঙ্গে নিন।"

—"সে কি ক'রে হবে রাধারাণী? আশ্রম কে দেখ্‌বে?"

—"আশ্রমেরই একটি মেয়ের ওপরে ভেতরকার সব কাজের ভার দিয়ে যাব। আমি তাকে বিশ্বাস করি। তারপর দেওয়ান বাবু রইলেন, বাইরের সব তিনিই দেখ্‌বেন, শুন্‌বেন।"

—"না রাধারাণী, অত হাঙ্গামাতে কাজ নেই, দুদিন মনের খুসিতে থাক্‌তে পেলেই আমার অসুখ আপনিই সেরে যাবে।"

—"না, না, আপনি বুঝ্‌চেন না, রোগকে অবহেলা করা ঠিক নয়। আপনার ভালো-মন্দর ওপরেই সব যখন নির্ভর কর্‌চে, আপনাকে তখন যেতেই হবে?"

—"মুকুল কি বল?"

—"আমি? আমি আবার বল্‌ব কি? দিদির কথাই ঠিক।" —মুকুল মুখের কথায় দিদির প্রস্তাবে সায় দিলে বটে, কিন্তু আসলে কল্‌কাতা ছেড়ে তার এক পাও নড়্‌তে ইচ্ছা ছিল না। তার মনে হোতো, এই কল্‌কাতারই কোথাও একদিন-না-একদিন স্বামীর সঙ্গে দেখা হবেই!

কোথায় যাওয়া যায়, তাই নিয়ে আলোচনা চল্‌তে লাগ্‌ল। মধুপুর? না, ভারি ঘিঞ্জি। এক সহর থেকে আর এক সহরে গিয়ে লাভ কি? দেওঘর? সেখানেও লোক ঢের, আলোক আর জনতার মধ্যে যেতে রাজি নয়। কার্ম্মাটার?—প্রাকৃতিক দৃশ্য কিছুই নেই। শেষটা ঠিক হোলো, তারা গোমো-জংসনে যাবে। কল্‌কাতার কাছেই, অথচ স্বাস্থ্যে আর শোভায় মধুপুর কি দেওঘরের চেয়ে অনেক ভালো, আর লোকজনও বেশী নেই।

দুই

আলোকনাথরা যে বাংলোখানি ভাড়া নিলে, সেখানি কোন সাহেবের, দিব্যি বড়সড়ো, আর একেবারে সার-বন্দী কতকগুলো পাহাড়ের কোল-ঘেঁসা। সাম্‌নেই অনেকখানি ঘেরা-জমি, আগে এখানটায় যে চমৎকার একটি বাগান ছিল, কতকগুলো ছাগলে-খাওয়া মাথা-মুড়ানো ফুলগাছ দেখে এখনো তা আন্দাজ করা যায়। কোন কোন গাছে আজও দু-চারটে ফুল ফুটে আছে; তাদের যত্ন কর্‌বার আর কেউ নেই, আদর ক'রে কেউ তাদের তুলেও আনেনা, তারা অকারণে ফোটে এবং অকারণেই গন্ধ বিলিয়ে সমীরের দীর্ঘশ্বাস শুনে কাঁটা-জঙ্গলে ঝ'রে প'ড়ে ম'রে যায়। মালিক নেই, তাদের মরণেও কেউ দুঃখ করে না।...মুক্তমালার মনে হোলো, তারও প্রাণ ঠিক এই পোড়ো ফুল-বাগানের মত!

বাংলোর আর এক দিক থেকে দেখা যায়, পরেশনাথের উচ্চশিখর মেঘে ঢুঁ মেরে আকাশকে ধর্‌তেই যেন উপরপানে প্রাণপণে উঠে গিয়েছে! তার মাথায় মুকুটের মত একটি জৈন-মন্দির, দূর থেকে তার সাদা রং এতটুকু ব'লে মনে হচ্ছে। এদিকে-ওদিকে আরো যে কত ছোট-বড় পাহাড় নিবিড় বনের শ্যামলতা গায়ে মেখে ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, তা আর গুণে ওঠা যায় না। কল্‌কাতার এত কাছে এত-বেশী পাহাড় আর বিজন শ্যাম-সৌন্দর্য্য বোধহয় আর কোন দেশেই নেই।

আলোকনাথ কল্‌কাতা ছেড়ে আস্‌তে চাইছিল না বটে, কিন্তু এখানে এসে সত্যিই সে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। জেলখানার পাঁচিলের চাপে তার প্রাণের যে অনিষ্ট হয়েছিল, এই সুন্দরী প্রকৃতির উন্মুক্ত হৃদয়ের আশ্রয়ে শীঘ্রই যে সেই প্রাণের সব ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে, এখানে পা দিলেই আলোক যেন তা স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌লে।

বাংলো আর পাহাড়ের মাঝখানেই ছোট্ট একটি পায়ে-চলা পথ। পথের পাশে একটি মাঠ। সেই মাঠে জনকতক সাঁওতালী মেয়ে মাদলের তালে নাচ্‌ছিল। আলোক খানিকক্ষণ তাদের নাচ দেখে চেঁচিয়ে ডাক্‌লে, "রাধারাণী! মুকুল! শীগ্‌গির এস!"

রাধারাণী আর মুকুল ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "কি?"

আলোক উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্‌লে, "দেখ, দেখ, কি চৎকার নাচ! কি সুন্দর গড়ন! কেমন ছবির মতন ভঙ্গি!"

মুকুল বল্‌লে, "কিন্তু কি কালো, মাগো!"

—"হোক্-গে কালো, রঙে কি আসে যায়? তোমার কল্‌কাতার চশ্‌মা-পরা, হাড়-ঠক্‌ঠকে কি বেঢপ-মোটা শিক্ষিত রূপসীগুলিকে দেখ্‌লে কিন্তু সন্ধ্যে-বেলায় আমার বুকটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে!—এমন সুডৌল গড়ন, এমন পূরন্ত স্বাস্থ্য সহরের ইস্কুলে তৈরি হয় না!"

—"তা ঐ বুড়ো বুড়ো মাগীগুলো এমন ধিঙ্গির মতন নেচে মর্‌চে কেন?"

—"ওরা যে জ্যান্ত, তাই না নেচে পারে না। দেখ্‌চ, নিটোল হাতে-পায়ের তালে তালে গতির কি লীলা, ও-নাচের ছন্দে জীবনের আনন্দই যে বিচিত্র হিল্লোলে ফুটে উঠ্‌চে! পৃথিবীর প্রায় সমস্ত স্বাধীন আর সভ্য দেশেই ভদ্র-মেয়েরা নাচ্‌তে জানেন, কেবল এই বাঙ্‌লা দেশের নারী-সমাজেই নাচটাকে পাগ্‌লামি ব'লে ভাবা হয়। জীবন থাক্‌লে তবে তো আমরা নাচ্‌ব—আমরা কি আর বেঁচে আছি! যেমন পুরুষ, তেম্‌নি মেয়ে—আমরা সবাই প্রেতাত্মা!"

—"দাদা, তোমার কথা শুনে আমার বুকটা ধড়াস্-ধড়াস্ কর্‌চে, তবে কি আমারও প্রেতাত্মা? ওরে বাবা!"

—"না, ঠাট্টা নয় মুকুল, আমি ঠাট্টা কর্‌চি না।"

—"কে বল্‌চে ঠাট্টা? প্রেতাত্মা নিয়ে ঠাট্টা? এ যে ভয়ের কথা!"

—"হ্যাঁ, আমিও বলি ভয়ের কথা! আগে স্বাস্থ্য চাই, শক্তি চাই, আনন্দ চাই—শ্মশানে ব'সে হাজার রাজনীতির মন্ত্র পড়্‌লেও মড়া কখনো বেঁচে উঠ্‌বে না! আগে মানুষ বাঁচ্‌তে শিখুক্, তারপর আর সব। তোমাদের চোখ থাক্‌লে, আজ সাঁওতালী মেয়েগুলি কালো হ'লেও এদের ভালো দিকটা তোমরা দেখ্‌তে পেতে। ভালো ভাস্করের হাতে-গড়া কষ্টিপাথরের সুডৌল মূর্ত্তিও তো কালো, তবু কি তাকে সুন্দর মনে হয় না? আর আমরাই বা এমন-কি গোরার জাত্, হাজারে একটি মানুষের রং কটা হয় কিনা সন্দেহ! আমরা যদি ওদের কালো ব'লে নাক বাঁকাই, তবে সায়েবরা 'কালা-আদ্‌মী' বল্‌লে আমাদের অত অভিমান হয় কেন?"

—"হ্যাঁ দাদা, আমার মাথা খাও,—এদের মধ্যে কোন্‌টিকে তোমার বেশী পছন্দ হয়েচে খুলে বল তো! দেখি, সে আমাদের বৌদি হ'তে রাজি হয় কিনা!"

আলোক এবার হেসে ফেল্‌লে। ঘরের ভিতরে চ'লে যেতে যেতে বল্‌লে, "তোমার মত দুষ্টুকে বোঝানো মিছে।"

রাধারাণী এতক্ষণ চুপ ক'রে নাচ দেখ্‌ছিল। নাচ থামিয়ে "লোগোয়ান খিস্‌কো সিনিন ঘাণ্টাবাড়ী মা কাওয়াড়" ব'লে, সকলে মিলে কি একটা গান গাইতে গাইতে সাঁওতালী মেয়েরা যখন চ'লে গেল, রাধারাণী তখন ফিরে বল্‌লে, "হ্যাঁ লা বেহায়ার ধাড়ী! আলোকবাবু কি তোর সমবয়সী? ওঁকে নিয়ে অত যে ঠাট্টা কর্‌ছিলি বড়? দেব গালে এক ঠোনা—তা জানিস্?"

—"ইস্, ঠোনা খেয়ে ঠোনা যেন আমি ফিরিয়ে দিতে জানিনা! এখানে আশ্রম নেই, কাজকর্ম্ম নেই, ঠাট্টাঠুট্টি না থাক্‌লে সময় কাটবে কেমন ক'রে? আর তুমি জানোনা দিদি, আমার দাদাটির মাথায়

বিলক্ষণ একটু ছিট্ আছে! নাচের কথায় আমি যদি উৎসাহ দেখাতুম, তবে উনি হয়ত ফস্ ক'রে ব'লেই বস্তেন যে,—'নাচ ভারি ভালো ব্যাপার। এবার থেকে তোমাদেরও নৃত্য-বিদ্যা শিখ্‌তে হবে!' তারপর হয়ত একটি নাচ্‌নাওয়ালী মেম-মাষ্টারনী এসে ঘাড়ে চাপ্‌তেন। তারপর আশ্রমেতে মেয়েরা নাচ্‌ত, তুমি নাচ্‌তে, আমি নাচ্‌তুম—ধেই, ধেই, ধেই! কেমন, এতে তুমি রাজি আছ? তাহ'লে তোমার পায়ে পড়ি, একটিবার নাচো-না দিদি, দেখি তোমায় কেমন দেখায়!"

—"যা ছুঁড়ী যাঃ, আমাকে আর জ্বালাতে হবে না, আচ্ছা ফাজিল মেয়ে যাহোক্!"

—"কী, আমাকে গালাগাল? তবে এই আমি চল্‌লুম বেরিয়ে!"

—"কোথায় চল্‌লি লো, এখানে আবার তোর কোন্ যম আছে?"

—"যমের বাড়ী নয় দিদি, নদীর ধারে বেড়াতে। তুমি তো আর দাদাকে ফেলে আস্‌বে না, থাকো তুমি একলা ব'সে!"—এই ব'লে মুকুল হন্‌হন্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল।

পায়ে-চলা পথটি ঝোঁপঝাড়, গাছতলা আর পাহাড়ের পর পাহাড়ের আশপাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে উঠে-নেমে নদীর ধারে গিয়ে প'ড়েছে,—পাহাড়ের টঙে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে মনে হয়, যেন একটা মস্ত-লম্বা অজগর সারাদিন চিত্রার্পিতের মত স্থিরভাবে প'ড়ে প'ড়ে ক্রমাগত নদীর জলপান কর্‌ছে! পথের দুইধারেই অগাধ সবুজের রাজত্ব—বনের পর বন, কাঁপ্‌চে, নড়্‌ছে, দুল্‌ছে, আর দিন-রাত অনন্ত মর্ম্মর-প্রলাপ বক্‌ছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট মাঠ, নরম ঘাসের নীল-গালিচায় মোড়া—এক-এক ধারে বনচ্ছায়ার পাড় বোনা! কোথাও পাখী ডাক্‌ছে, কোথাও হরিণ চর্‌ছে, কোথাও স্বর্গচ্যুত যূঁইয়ের মালার মত বকের ঝাঁক্ উড়ে যাচ্ছে!

এরই মধ্য দিয়ে মুকুল রোজ বেড়িয়ে বেড়াত—রূপ রাজ্যের বিভোর অতিথির মতন। বিজন প্রকৃতির খোলা বুকের মাধুরী যে কি বিচিত্র, মুকুল তা জান্‌ত না। কারণ এর আগে সে আর কখনো কল্‌কাতার বাইরে পা বাড়ায় নি। কখনো সে গাছের তলায় ঘাসের বিছানায় গড়াগড়ি দিত, কখনো বনে বনে প্রজাপতির পিছনে ছুটোছুটি কর্‌ত, কখনো নদীর ধারে গিয়ে বালির ঘর গড়্‌তে বস্‌ত। এখানে দেখ্‌বার শোন্‌বার বল্‌বার লোক কেউ নেই—মানুষের মনে বাসার যে সকল আনন্দ সংসারের ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে লুকিয়ে থাকে, এখানে একলা এলে সে যেন বাইরে বেরিয়ে চঞ্চল হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌তে চায়।

এম্‌নি প্রতিদিন একবার ক'রে মুকুল বাইরে হাঁপ ছাড়তে আস্‌ত। কোন কোন দিন বুক-ভরা দরদ নিয়ে সে বনের আড়ালে কাঁদতে বস্‌ত—এখানে কেঁদেও বুঝি স্বস্তি পাওয়া যায়! নিজের কথা, স্বামীর কথা, খোকার কথা, শ্বশুরবাড়ী বাপের-বাড়ীর কথা—এম্‌নি কত কথা! স্বামী কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, আর কি ফিরে আস্‌বেন না, আর কি দেখা হবে না, দেখা হ'লেও আর কি তিনি বিশ্বাস ক'রে তাকে ঘরে নেবেন না? স্বামী যে সত্যিই তাকে ভালোবাস্‌তেন, এতে তার আর একটুও সন্দেহ নেই! তবে! সমাজের ভয়?··· সমাজের কথা মনে হ'লেই বুকটা তার দুদ্দুড়্ ক'রে উঠ্‌ত! মনে হোতো প্রকাণ্ড একটা হাঁ—মুখ নেই, চোখ নেই, নাক নেই, দেহ নেই, খালি প্রকাণ্ড একটা হাঁ তাকে গিলে ফেল্‌বার জন্যে যেন আকাশ বাতাস পৃথিবী সমস্ত ছেয়ে রয়েছে!

কোন কোন দিন পুরাণো সুখস্মৃতিগুলি ছবির পরে ছবির মত তার চোখের সুমুখ দিয়ে চ'লে যেত। স্বামী কবে কি আদর যত্নের কথা, নিজের অটুট প্রেমের কথা ব'লেছিলেন, কবে তার জন্যে কি সখের জিনিস

কিনে এনেছিলেন, কবে লুকিয়ে এসে হঠাৎ চুম্বন ক'রে তাকে চম্‌কিয়ে দিয়েছিলেন, কবে কোন্ ঘন ঘোর বর্ষা-নিশীথে বাজের আওয়াজে জেগে উঠে, ভয়ে সে প্রাণপণে স্বামীকে জড়িয়ে ধ'রেছিল, তার স্মৃতির কৌটায় সধবার সিঁদূরের মত সাবধানে সেই-সব অন্যের-কাছে-নগণ্য কথাগুলি জমা করা আছে,—ভোলেনি, সে ভোলেনি !

এইভাবে দিনের পর দিন যায়,—প্রকাশ্যে হাসি-মাখা, গোপন অশ্রু-ভরা দীর্ঘ দিনগুলি।

একদিন বনের পথে যেতে হঠাৎ সে শিশুর কান্না শুনতে পেলে। কে যেন কেঁদে "মা মা" ব'লে ডাক্‌ছে !

এদিকে-ওদিকে চেয়ে দু-চার পা এগুতেই দেখ্‌লে, একটি ফুট্‌ফুটে খোকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাপুস্ চোখে কাঁদ্‌ছে—কাঁটাজঙ্গলে বেচারীর জামা আট্‌কে গেছে, হাত ছ'ড়ে আঙুল দিয়ে তার রক্ত পড়্‌ছে !

মুকুল তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার কর্‌লে, আঁচল দিয়ে তার আঙুলের রক্ত, চোখের জল মুছিয়ে দিলে। তারপর খোকার মুখে চুমু খেয়ে তাকে বুকে চেপে ধ'রে আদর ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল—"ও আমার সোনার যাদু, ওরে আমার মাণিক-সোনা !"

দু-হাতে তার নরম-নধর গালদুটি চেপে ধ'রে, নিজের মুখের কাছে তার কচি মুখখানি টেনে এনে মুকুল অচপল চোখে খানিকক্ষণ ধ'রে দেখ্‌লে।—কি চমৎকার খোকা! যেন ক্ষীরের পুতুলটি! নিজের ছেলের কথা ভেবে তার মায়ের প্রাণ হা হা ক'রে উঠ্‌ল। আর কি সে মা-ছোড় ছেলে বেঁচে আছে ?

তারপর অবাক হয়ে ভাবতে লাগ্‌ল, এ কার ছেলে—একলা এই বনেই বা এল কেমন ক'রে ?

খোকা কান্না ধর্‌ল—"মা দাবো !"

—"ওরে বাছা, কেমনতরো তোর মা, কে জানে! বনে ব'সে ছেলে কাঁদে—সে পোড়ারমুখী কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে!"

আধো আধো গলায় খোকা ফের কেঁদে বল্লে, "মা যাবো!"

খোকাকে কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে মুকুল বল্লে, "জানিনে বাপু, এ কার ছেলে কুড়িয়ে পেলুম!"

—"ইস্, ছেলে কিনা বুনো গাছের ফল, কুড়িয়ে অমনি পেলেই হোলো! মালিক হাজির!"

আশ্চর্য্য হয়ে ফিরে মুকুল দেখ্লে, একটি যুবতী ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাস্ছে!

সে দু-হাত বাড়িয়ে দিলে. খোকা ঝাঁপিয়ে তার কোলে গিয়ে পড়্ল।

মুকুল বল্লে, "আপনার ছেলে?"

—"হ্যাঁ। একটা উঁচু ঢিপির ওপরে উঠে ফুল তুল্ছিলুম. নীচে নেমে দেখি খোকা আর নেই।"

—"ছিঃ, বনে কখনো ছেলে ছাড়্তে আছে? যদি কোন গর্ত্তে-টর্ত্তে প'ড়ে যেত?"

যুবতী শিউরে উঠে খোকাকে আরো-জোরে বুকে চেপে ধর্লে। তারপর কৃতজ্ঞ স্বরে বল্লে, "ভাগ্যিস্ আপনি এসে পড়েছিলেন! ভগবান বাঁচিয়েচেন।"

মুকুল বল্লে, "আপনারা কি এখানে বেড়াতে এসেচেন?"

—"না, আমার স্বামীর অসুখ। শুনেচি, এখানকার হাওয়া ভালো। তাই এসেচি। নিজে হাওয়া খেতে নয়—ওঁকে খাওয়াতে।"

—"কল্কাতা থেকে?"

—"না, আমরা এলাহাবাদে থাকি। আপনারা?"

—"কল্কাতায়।"

দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এম্‌নি সব নানান-রকম আলাপ-পরিচয় হোলো। একদিনেই গলাগলি-ঢলাঢলি—প্রগাঢ় বন্ধুত্ব বল্‌লেও চলে! এটি হচ্ছে বিশেষ মেয়েলি গুণ। একদিনেই তারা পরকে আপন কর্‌তে পারে। পুরুষ একদিনে কিছু কর্‌তে পারেনা—মিত্রকে শত্রু করা ছাড়া!

বিদায় নেবার সময় যুবতী বল্‌লে, "ভাই, এখানে দেড়মাস আছি, গোঁফ ছাড়া মানুষের মুখ দেখ্‌তে পাইনা, তোমাকে পেয়ে যেন বাঁচ্‌লুম। আবার দেখা হবে তো?"

—"হবে বৈকি ভাই! এদিকে যেদিন বেড়াতে আস্‌বে, আমাকে ডেকে নিয়ে যেও। ঐ যে বাংলো দেখ্‌চ, আমরা ঐখানেই থাকি।"

"এবার থেকে রোজ বিকেলে আস্‌ব। তোমাদের ওখানে আর কে আছেন?"

একটু থতমত খেয়ে মুকুল বল্‌লে, "আমার দাদা আর দিদি।"

—"আর প্রাণেশ্বরটি বুঝি কল্‌কাতায় থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌চেন, ঘাস খাচ্চেন আর আপিসে বেরুচ্চেন? তা ব্যবস্থা ভালো।"

মুকুল নীরবে একটুখানি ম্লান হাসি হাস্‌লে।

—"ঐ যাঃ, এত আবোল-তাবোল বকা হোলো, কিন্তু মূলে হাবাৎ! এখনো তোমার নামটি শুনিনি যে!"

—"মুকুলমালা। তোমার?"

—"নলিনী। আর একটি ডাকনাম আছে।"

—"কি?"

—"আহ্লাদী। কিন্তু এ নামে ডাক্‌লে মোটেই আমার আহ্লাদ হয় না।" এই ব'লে নলিনী হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে গেল।

তিন

রাধারাণীর কড়া পাহারায় আলোক একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে।

উদর-সেবায় আলোকের উৎসাহ বেশ একটু প্রবল ছিল। খাবার দেখ্‌লেই যখন-তখন অত্যন্ত অসময়েও তার ক্ষুধার পুনর্জন্ম হোতো। সত্যি বল্‌তে কি, তার এই খাওয়াটা 'খাওয়া' না-হয়ে অনেকটা নেশার মতই হয়ে উঠেছিল।

জেলে গেলে জন্ম-মাতালেরও নেশা ছুটে যায়, সুতরাং আলোকের খাওয়ার নেশা যে সেখানে দস্তুরমত মাটি হয়ে গেয়েছিল, তা বোধ হয় না বল্‌লেও চলে। তার আশা ছিল, খালাস হয়ে এ নেশা ফের দু-হাতে সুরু করবে, কিন্তু অতি-সাবধানী রাধারাণী জ্বরের অছিলায় এতেও বেজায় বাদ সাধ্‌লে।

দু-বেলায় পেট ভ'রে মা-খুসি খাওয়া তো দূরের কথা, নিয়মের বাইরে টুকিটাকি খাবার পর্য্যন্ত আলোকের অদৃষ্টে জুটত না। দু-চারবার ভাঁড়ার-ঘরে অসাধু চেষ্টায় ঢুকে হাতে হাতে ধরা প'ড়ে গিয়ে সে চেষ্টাও ছাড়্‌তে হয়েছে। চাকরকে লুকিয়ে বাজার থেকে কিছু আনবার ফরমাজ দিলেও, সে চুপি চুপি গিয়ে তখনি রাধারাণীকে ব'লে দেয়।

আলোক শেষটা একদিন হতাশভাবে বল্‌লে, "রাধারাণী, তুমি জেল-দারোগার চেয়েও নির্দ্দয়! জ্বরে আমার কোন ভয় নেই, কিন্তু আমার অদৃষ্টে দেখ্‌চি অনাহারে-মৃত্যুই অকাট্য!"

রাধারাণী হেসে বল্‌লে, "মনে রাখ্‌বেন আলোকবাবু, আপনি এখানে খাবার খেতে আসেননি—হাওয়া খেতে এসেছেন।"

আলোকনাথ আক্ষেপ ক'রে বল্‌লে, "হায়রে কপাল, যে সংসারে

আমিই কর্ত্তা, সেখানে চাকরটা পর্য্যন্ত আমার কথা শোনে না! শেষে কি 'নিজ বাস-ভূমে পরবাসী' হলুম?"

রাধারাণী সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে, "ভয় কি আলোকবাবু, ভালো ক'রে সেরে উঠুন, তারপর যত চান নিজে রেঁধে খাওয়াবো।"

আলোকনাথ করুণ-স্বরে বল্‌লে, "কিন্তু তার আগেই আমার সূক্ষ্মদেহ যে খাবি ভক্ষণ ক'রে পঞ্চভূতে বিলীন হবে! মরা-ঘোড়া ঘাস খায় কি?"

রাধারাণী বল্‌লে, "ছিঃ, ও-কথা আপনি ঠাট্টা ক'রে বল্‌লেও আমার কষ্ট হয়। আর কখনো বল্‌বেন না।"—রাধারাণী আস্তে আস্তে চ'লে গেল!

আলোকনাথ রাধারাণীর যাওয়ার পথের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে রইল। রাধারাণী কি গেল-জন্মে তার কেউ ছিল? বোধ হয়। নইলে তার মুখ চেয়ে রাধারাণীর প্রাণে এত মমতা কেমন ক'রে হোলো? হ'তে পারে, তাকে যত্ন করা সে কর্ত্তব্য ব'লে ভাবে। কিন্তু কর্ত্তব্যের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে—সে যে সীমার গণ্ডীও মানে-নি! এই করুণাময়ী নিশিদিন তাকে যে ভাবে প্রাণ-গলানো যত্ন দিয়ে সাবধানে আড়াল ক'রে আছে, তার তুলনা আলোক আর কোথাও পেয়েছে ব'লে মনে কর্‌তে পার্‌লে না। মা-বাপের আদর-যত্ন, ভাই-বোনের ভালোবাসা যে কেমন, সে তো তার স্বাদ কখনো পায়নি! তা কি এর চেয়েও মধুর? সন্দেহ!

·········সেদিনের সন্ধ্যায় ভারি গুমোট, গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ছে না। আকাশে পরিপূর্ণ চাঁদের আলো, কিন্তু দখিনা আজ জ্যোৎস্নার গায়ে সুরভিশ্বাস মাখিয়ে দিতে আসেনি।

রাধারাণী ঘরের কোণে আলোর কাছে ব'সে কি একখানি বই পড়্‌ছে। বিকেলে একটা উড়ে চাকরকে বাজারে মুড়্‌কী কিন্‌তে পাওয়া যায় কিনা দেখ্‌তে বলা হয়েছিল। সে বাজারে মুড়্‌কী কিন্‌তে গিয়ে

এক-জোড়া মুর্‌গী কিনে এনেছিল। ঘরের বাইরে এখন পর্যন্ত মুকুলমালা তাই নিয়ে উড়েটাকে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আলোকনাথ তাই শুন্‌ছে, হাস্‌ছে এবং গুমোটের চোটে বাতিব্যস্ত হয়ে মাঝে মাঝে এপাশ-ওপাশ কর্‌ছে।

রাধারাণী বই থেকে মুখ তুলে বল্‌লে, "অত ছটফট করছেন কেন? স্থির হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন না!"

আলোকনাথ বল্‌লে, "কথা সহজ, কাজ শক্ত। রাধারাণী, এমন বিষম গুমোটে মানুষ খুনও করা যায়, কিন্তু ঘুমনো একেবারেই সম্ভব নয়।"

রাধারাণী তখনি বই মুড়ে উঠে বল্‌লে, "আচ্ছা, আমি হাওয়া করচি। আপনি চোখ মুদুন।"

আলোকনাথ বল্‌লে, "না, না, যখন হাওয়া খেতে এদেশে এসেও হাওয়া পাচ্চি না, তখন তোমার ও পাখার ঝাপ্টায় ঘরের ভেতর খালি গরমই আন্দোলিত হবে, কিন্তু হাওয়াও হবে না, ঘুমও হবে না।"

রাধারাণী তবু শুন্‌লে না, ক্যাম্প-খাটের পাশে এসে ব'সে একখানা হাতপাখা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বল্‌লে, "আচ্ছা, আপনি চোখ আর মুখ দুইই বন্ধ ক'রে ফেলুন তো, ঘুম কেমন না হয় দেখি!"

—"কি অস্বস্তি! বুড়ো বয়সে তোমরা আমাকে কচিখোকা ক'রে ফেল্‌লে দেখ্‌চি। তাহ'লে ঘুমপাড়ানি ছড়াটাই বা বাকি থাকে কেন? সেটাও সুরু করো।"

—"আবার কথা?"

—"বেশ। যো হুকুম। কেননা 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'।" এই ব'লে আলোক পাশ ফিরে শুয়ে চোখ মুদ্‌লে।......তারপর কখন যে তন্দ্রা এসে চুপিচুপি তাকে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌লে, সেটা সে টেরও পেলে না।.........

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ কচ্‌লে চাইতেই সাম্‌নের দেওয়ালের ঘড়ির উপরে নজর পড়্‌ল। রাত দেড়টা বেজেছে।

ওদিকে ঘরের মেঝের উপরে তখনো ব'সে আছে রাধারাণী, তার হাত-পাখা ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে তখনো চল্‌ছে বটে, কিন্তু তার ঘুমন্ত মুখখানি ক্যাম্প-খাটের এককোণে কাৎ হয়ে এলিয়ে পড়েছে।......এ কি অপূর্ব্ব স্নেহ-মমতা! যে ঘুমন্ত মানুষটির অশ্রান্ত হাতখানি এই গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তারি জন্যে জেগে আছে, তার দরদী প্রাণের এ-হেন পরিচয় পেয়ে আলোকনাথের বুকের ভিতরে একটা অজানা আবেগের তুফান উথ্‌লে উঠ্‌ল।—

বাইরে তখন রাত যেন থম্‌থম্‌ কর্‌ছে,—পাহাড়ের ঢালু গায়ে আর নিস্তব্ধ বনভূমির উপরে কার অদৃশ্য হস্ত চন্দ্রকর-ধারায় তুলি ডুবিয়ে রূপের রং বুলিয়ে দিয়েছে। আড়ালে নদীর অবিরাম কল-বেদনার উচ্ছল কান্না নিশিথিনীর নীরব বীণায় আকুল সুরের ঝঙ্কার তুল্‌ছে।

খোলা-জান্‌লা দিয়ে চাঁদের আলোর একটি রেখা ধীরে ধীরে স'রে রাধারাণীর ঘুম-মাখানো মুখের উপরে এসে পড়্‌ল.........আলোকনাথ সেদিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পার্‌লে না!

ঘড়িটা কর্‌ছে টিক্‌, টিক্‌, টিক্‌,—যেন স্তব্ধ রাত্রির হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনা যাচ্ছে! আলোকনাথের বুকটাও কর্‌ছে ঢুপ্‌, ঢুপ্‌ ঢুপ্‌!

আলোকের মুখ আস্তে আস্তে রাধারাণীর মুখের কাছে কি এক অজানার টানে এগিয়ে গেল—তার ঘোম্‌টা-খসা এলানো চুলগুলি, তার টানাটানা ভুরু-দুখানি, তার চোখ-নাক-ঠোঁট, তার মোমের মতন নরম বেঁকে-পড়া ঘাড়টি, তার নধর-নিটোল বাহুদুটি—এই সমস্তের উপরেই তার বিহ্বল দৃষ্টি পথহারা পথিকের মত বার বার ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ যেন কি স্বপ্ন দেখেই রাধারাণীর বুকের ভিতর থেকে একটা

দীর্ঘনিশ্বাস বাইরে বেরিয়ে এল—সেই নিশ্বাসে আত্মহারা আলোকের চমক চট্ ক'রে ভেঙে গেল। কে যেন আচম্বিতে তার পিঠে এক চাবুক বসিয়ে দিলে!……নিজে-নিজেই সে ব'লে উঠ্ল—"ছিঃ!

তারপরেই সে গলা তুলে ডাক্ দিলে, "রাধারাণী, রাধারাণী!"

রাধারাণী ধড়্মড়্ ক'রে জেগে উঠে বস্ল—তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টেনে দিলে!

—"রাধারাণী, দুটো বাজে!"

চম্‌কে ঘড়ির দিকে তাকিয়েই লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে উঠ্ল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে, আর একটি কথা না ক'য়েই ঘর থেকে সে একরকম ছুটেই পালিয়ে গেল।

আলোকনাথ আবার শুয়ে পড়্ল। জান্‌লা দিয়ে আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নার প্রবাহের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে, চুপ ক'রে সে কি যে ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

… … …

নলিনীর সঙ্গে মুকুলের আলাপ আজকাল খুব জমে উঠেছে। বিকাল হ'লে নলিনী তাকে রোজ ডাক্‌তে আস্‌ত। তারপর দুটিতে মিলে মাণিক-জোড়ের মত বনের ভিতর গিয়ে ঢুক্‌ত। দুজনেই তারা বন্ধ-খাঁচার পাখী, আজ ছাড়া পেয়ে স্বাধীনতাকে প্রাণপণে উপভোগ ক'রে নিচ্ছে।

নলিনী একদিন বল্‌লে, "ভাই মুকুলমালা, তোমার সঙ্গে কি পাতানো যায় বল দেখি?"

মুকুল বল্‌লে, "সই, মকর, মনের-কথা—"

—"দূর, দূর—ও-সব পুরণো হয়ে গেছে!"

নলিনীর চোখ পড়্ল—সাম্‌নের পাহাড়ের উপরে! সেখানে সারি

সারি আম্লকি গাছ পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি ক'রে পাহাড়ের রোদ-পোয়ানোতে বাধা দিচ্ছে।

নলিনী বল্লে, "ওহো, ঠিক হয়েচে! তুমি আমার আম্লকি, আর আমি তোমার আম্লকি! একেবারে আন্কোরা নতুন!"

কোন কোন দিন বেড়াতে আর গল্প কর্তে তাদের সন্ধ্যা হয়ে যেত এবং আলোকনাথ লাঠি ঘাড়ে ক'রে খুঁজ্তে বেরুত!

একদিন আলোকনাথ রেগে বল্লে, "মুকুল, তুমি আর তোমার এই বন্ধুটি কোন্দিন আমাকে বিপদে ফেল্বে দেখ্চি। বনে-জঙ্গলে অম্নি বেড়িয়ে বেড়ালেই হোলো?"

মুকুল বল্লে, "বিপদ আবার কিসের দাদা? এ তো আর কল্কাতার রাস্তা নয়, এখানে মানুষ-টানুষ কিছুই নেই। আঃ, বেঁচেচি!"

—"মানুষ নেই ব'লেই তো যেতে মানা কর্চি! কোন্দিন যে দুটিতেই বাঘের মুখে যাবে!"

—"মানুষের চেয়ে বাঘের মুখে যাওয়া ঢের ভালো।"

আলোকনাথ গম্ভীর মুখে ভাব্তে লাগ্ল—হাঁ, মুকুলের এ-কথা সঙ্গত বটে!.........

নলিনী সেদিনও মুকুলকে ডাক্তে এসেছে।

মুকুল বেরিয়ে এসে বল্লে, "ভাই আম্লকি, ঘরের ভেতরে এসে বোসো। আজ আমার একটু বাকি আছে।"

নলিনী অগত্যা ঘরের মধ্যে এসেই বস্ল। তারপর বল্লে, "সারাদিনেও তোমার সাজ হয় না ভাই? এইতেই এত, না-জানি কর্ত্তাটি থাক্লে কি হোতো!"

—"পোড়াকপাল, সাজ তো ভারি! তোমার মত পটের বিবিটি সেজে আমাকে আবার কবে বেরুতে দেখ্লে?"

নলিনী বল্লে, "কেন ভাই আম্লকি, তোমাকে সাজ্তে কোনদিন তো সাজ্তে দেখিনি? বরের জন্যে মন কেমন করে নাকি?" ব'লেই সে মৃদুস্বরে হাত নেড়ে গান ধর্‌লে—

প্রাণকে সখি, মানা ক'রে দে!
কাণকে ধ'রে চান্‌কে দিবি লো,—
কাল্‌কে কালার, এলে ভোরেতে!

মুকুল মনের হুহু চাপা দিয়ে বল্লে, "না ভাই আমলকি, আমার উনি কালার মত কালো নন যে, প্রাণ থাক্‌তে কাণ ধ'রে অপমান করব! তার চেয়ে পা ধর্‌তে বল তো রাজি আছি।"

নলিনী তখন সুর পাল্টে চুপিচুপি আর একটা গান সুরু করলে:—

কালো না হয়, ধলোই হোলো—
যেমন খোদার কারসাজি,
কর্ণ না পাও, কণ্ঠ ধরো—
ধর্‌তে পা তার নই রাজি!

তারপর গান থামিয়ে কি-একটা বল্‌তে গিয়েই, একদিকে চেয়ে তার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল।

তার দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে মুকুলমালা বুঝ্‌লে, সে তার স্বামীর সঙ্গে তোলা ফটোগ্রাফখানার দিকে তাকিয়ে আছে। কলকাতার এক ফটোগ্রাফারের দোকানে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে সে এই ছবিখানি তুলিয়েছিল। তারই অনুরোধে আলোকনাথ ফোটোগ্রাফারের কাছে গিয়ে 'নেগেটিভ' থেকে খানকয়েক নূতন 'কপি' কিনে এনে দিয়েছিল। এ ছবি অতীতের সেই সুখস্মৃতির ছবি—এখনো দিনে শতবার দেখে-দেখেও মুকুলের যেন তৃপ্তি হয় না। আসবার সময়ে তাই এখানিকে সে কলকাতায় ফেলে আসতে পারেনি।

মুকুল বল্‌লে, "কি দেখ্‌চ ?"

নলিনী বল্‌লে, "তোমার পাশে ব'সে উনি কে ?"

মুকুল গাঢ়স্বরে বল্‌লে, "বুঝ্‌তে পারচ না ? উনিই যে আমার বুকের ঠাকুর !"—তার চোখদুটি ভিজে উঠল।

নলিনী তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "একি ! তুমি কাঁদ্‌চ কেন ?"

মুকুলমালা তাড়াতাড়ি সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, "বড় মন কেমন কর্‌চে।"

আর কিছু না ব'লে নলিনী দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল—ছবিখানি ভালো ক'রে দেখ্‌বার জন্যে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খানিকক্ষণ দেখে সে ফিরে বল্‌লে, "ভাই আম্‌লকি, সত্যি বল্‌তে কি, তোমার স্বামীর চেহারাটি কিন্তু তোমার যুগ্যি হয়নি।"

এ স্পষ্ট সমালোচনা মুকুল যে পছন্দ কর্‌লে না, তার মুখ দেখেই সেটা বেশ বোঝা গেল।

নলিনী আবার বল্‌লে,—"রংটি নিশ্চয় কালো, ফোটোগ্রাফে এমন ফর্সা দেখাচ্চে।"

মুকুল প্রবল প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে, "না-না, উনি কালো নন—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।"

—"কপালখানি দস্তুরমত গড়ের মাঠ !"

—"পুরুষের বড় কপালই ভালো।"

—"চোখদুটি কুৎকুতে—"

—"ইস্‌, বল্‌তে হয় না ! ছবিতে ছোট দেখাচ্চে !"

—"নাকটি খ্যাঁদা নয় বটে, কিন্তু টিকলোও নয়।"

—"তাতে তোমার কি, তুমি তো আমার সতীন নও যে ওঁর নাক দেখে তোমার মন ভার হবে !"

নলিনী হা হা ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়্ল। তারপর বল্লে, "তা ভাই আম্লকি, তোমার স্বামী-রত্নটি মাকুন্দ ব'লে তোমার জন্যে আমার কিন্তু ভারি দুঃখ হচ্ছে।"

—"কে বল্লে মাকুন্দ, উনি যে গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন।"

—"ঝাঁটা-গোঁফ ব'লে বুঝি মরিয়া হয়ে তার মায়া ছাড়্তে বাধ্য হয়েছেন ?"

মুকুল কোনরকমে রাগ সাম্লে বল্লে, "না, গোঁফ কামানো যে এখনকার ফ্যাসান।"

—"ও ফ্যাসান ভালো নয়। গোঁফকামানো পুরুষদের দেখ্তে ঠিক গোঁফওলা মেয়ের মতই অদ্ভুত। আমার তো ভাই দেখ্তেই সহ্য হয় না।"

—"দেখ ভাই আম্লকি, তোমার এই গায়ে-পড়া সমালোচনাও কিন্তু আমার আর সহ্য হচ্ছে না। তুমি কি আমার সঙ্গে কোন্দল কর্তে চাও ?"

—"সত্যি কথায় বন্ধুও চটে। বেশ ভাই, আমি এই বোবা হলুম।" তারপর পাত্লা দু'খানি ঠোঁট কৃত্রিম অভিমানে ফুলিয়ে, নলিনী যেন আপন মনেই কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে হতাশ ভাবে গান সুরু কর্লে—

কথা কইবনা লো ললনা !
সত্যি-কথায় বন্ধু চটে—
সইবনা লো ছলনা !
রাখ্ব মুখে কুলুপ এঁটে,
মরব না-হয় বুকটা ফেটে,—
হাজার সাধো, হাজার কাঁদো,
হাজার কেন বলনা !
কথা কইবনা লো ললনা !

চার

সেদিন সারা পথটা নলিনী কেমন গম্ভীর হয়ে রইল, সেই ভঙ্গিভরে নাচ-গান-হাসি সমস্তই যেন ভুলে গেল।

স্বামীর চেহারার সমালোচনায় মুকুলও তার উপরে মনে মনে চটেছিল ব'লে খানিকক্ষণ কথা কইবার জন্যে কোনই আগ্রহ দেখালে না।

তারপর নদীর ধারে গিয়ে বালির উপরে মুকুল যখন পা ছড়িয়ে বস্‌ল, নলিনী হঠাৎ তার সাম্‌নে ধপ্‌ ক'রে ব'সে প'ড়ে বল্‌লে,—

"আম্‌লকি ভাই, আম্‌লকি!
রাগটি তোমার থাম্‌ল কি?

তোমার বরের কথা আমাকে বলনা ভাই!"

মুকুল একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "যাঁকে মনে ধরেনি, তাঁর কথা শুনে লাভ?"

নলিনী বল্‌লে, "ও হরি, এখনো রাগ যায়নি বুঝি? তা ভাই, আমি ঘাট মান্‌চি, অমন কাজ আর কখনো কর্‌ব না!" তারপর তার মুখের সাম্‌নে হাত নেড়ে সুর ধর্‌লে—

"কে জানে ভাই এমনধারা
তোদের প্রেমের পরিষৎ!
মান্‌চি 'তিনি' দেখ্‌তে খাসা,
মান্‌চি তিনি ভারি সৎ!
তাতেও যদি মন না ওঠে,
দিচ্চি না-হয় নাকে খৎ!

ভাই আম্‌লকি, আমি পরখ ক'রে দেখ্‌ছিলুম, স্বামী-নিন্দা তোমার সহ্য হয় কিনা!"

—"কেন?"

—"কেন?"—হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে নলিনী বল্‌লে, "কেন? তুমি কি ভেবেচ আমি এতই বোকা? আমি কিছু বুঝ্‌তে পারিনে? আমি চোখের মাথা খেয়েচি?"

সচমকে মুকুল বল্‌লে, "তুমি কি বল্‌চ?"

নলিনী নিজের দুহাত দিয়ে তার একখানা হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে, "তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে পর্য্যন্ত আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেচি, তুমি স্বামীকে চাও, কিন্তু তাঁকে পাও না! যেন তাঁর সঙ্গে তোমার চিরবিচ্ছেদ হয়েচে!"

নলিনীর মুখের দিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে মুকুল বল্‌লে, "কে তোমাকে বল্‌লে?"

—"তোমার মুখ, তোমার কথা, তোমার ভাবভঙ্গি! তোমার হাসি-খুসিতে আমি কি ভুলি? আমি যে মেয়েমানুষ! যে দুঃখ তুমি পেয়েচ, তা কি মেয়েমানুষের কাছে লুকোবার যো আছে? কথায় কথায় কতবার তুমি কত যে বেফাঁস কথা কয়ে ফেলেচ, আমি তো তা ভুলিনি! তাই তুমি যখন হাসো, আমার মনে হয়, একজন যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসচে!"

মুকুল 'না' বল্‌তে পার্‌লে না, ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে রইল।

নলিনী কোমল মিনতির স্বরে বল্‌লে, "ভাই, তোমার দুঃখ কি, আমাকে বল্‌বে না?"

অস্ফুট আর্ত্তনাদের মতন স্বরে মুকুল ব'লে উঠ্‌ল, "না, না, আমি বল্‌ব না!"

—"কেন বল্‌বে না? আমি কি তোমার বন্ধু নই?"

—"না ভাই, সেজন্যে নয়, কিন্তু শুন্‌লে—"

—"বল, বল, থাম্‌লে কেন ?"

—"শুন্‌লে তুমি আমাকে ঘেন্না কর্‌বে !"

—"তোমাকে ঘেন্না কর্‌ব ! কেন ?"

মুকুল বুঝ্‌লে, সে আবার একটা বেফাঁস্ কথা কয়ে ফেলেছে। নলিনীর "কেন"র জবাবে সে কি বল্‌বে ? না বল্‌লেও তো চল্‌বে না, বলার চেয়ে না-বলাই যে এখন বেশী খারাপ, বেশী সন্দেহকর !

এম্‌নি সাত-পাঁচ ভেবে মুকুল সোজা হয়ে বস্‌ল। শান্ত স্বরে বল্‌লে, "ভাই, আমি তোমাকে সব কথাই বল্‌ব। কিন্তু তার আগে তুমি বল, আমার কোন কথাই তুমি অবিশ্বাস করবে না ? তা যদি কর, তবে শুনে কোন ফল নেই।"

নলিনী বল্‌লে, "কেন অবিশ্বাস কর্‌ব ? আমাকে মিথ্যা ব'লে তোমার লাভ ? আমি কোথাকার কে, তোমার সঙ্গে দুদিনের দেখা, দিন-পনেরো পরে আমি থাক্‌ব কোথায় আর তুমি থাক্‌বে কোথায়—জীবনে হয়ত আর দেখাই হবে না। কি স্বার্থে তুমি মিছে কথা বল্‌বে ? তোমাকে আমি বিশ্বাস কর্‌ব।"

মুকুল তখন ধীরে ধীরে নিজের কাহিনী সুরু কর্‌লে—গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ! নলিনী তার মুখের পানে অপলক চোখে চেয়ে, নিষ্কম্প দীপশিখার মত বসে বসে একমনে সব কথা শুন্‌তে লাগ্‌ল।......

মুকুল কাঁদতে কাঁদতে তার কাহিনী শেষ কর্‌লে। নলিনী মুখ ফিরিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ব'সে আনমনে দেখ্‌তে লাগ্‌ল—একখানা মস্ত বড় শেওলা-মাখা পাহাড়-খসা পাথরের উপরে নদীর জল ক্রমাগত আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে এবং আর্ত্ত স্বরে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে !

মুকুল সঙ্কোচ-ভরা স্বরে বল্‌লে, "ভাই, তুমিও কি আমাকে পাপী ভাবলে ? তুমিও কি আমার সঙ্গে আর কথা কইতে চাও না ?"

নলিনী কোন জবাব দিলে না—হঠাৎ সাম্‌নের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাত দিয়ে মুকুলকে জড়িয়ে ধর্‌লে—তারপর তার চোখ উছ্‌লে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে অশ্রু ঝর্‌তে লাগ্‌ল……

সেই নির্জ্জন নদীতীরে, বন-পাহাড়ের ছায়ায়, বিশ্বের আড়ালে দুজনের আলিঙ্গনে দুজনে বদ্ধ হয়ে রইল অনেকক্ষণ—তাদের চার-চোখের জল এক হয়ে ঝ'রে তৃষিত বালু-শয্যাকে যেন স্নিগ্ধ ক'রে তুল্‌লে।

তারপর আবেগ-ভরে নলিনী বল্‌লে, "আমি তোমাকে পাপী মনে কর্‌ব ভাই? আমিও কি সমাজের মত নিষ্ঠুর? তুমি পাপী? তবে পুণ্যবতী কারা? সিন্দুকের ভেতর পূরে তালা-চাবি দিয়ে পুরুষ যাদের সতীত্ব রক্ষা করে? তাদের সতীত্বের মূল্য কতটুকু? তোমার মত অসহায় হয়েও তারা কি আপনাদের সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা দিতে পেরেছে? নিকষে না কষে পিতলকেও তো সিন্দুকে তুলে রেখে সোনা ব'লে ভাবা যায়! না, তোমাকে পাপী বল্‌লে আমারই পাপ হবে!"

ভাঙা-ভাঙা গলায় মুকুল বল্‌লে, "কিন্তু পাপ করিনি তো পাপীর মত এমন কঠিন শাস্তি পাচ্ছি কেন?"

—"এ তোমার পরীক্ষা ভাই, এ তোমার পরীক্ষা! এ পরীক্ষায় জানা গেল তুমি কতটা খাঁটি! আমি বল্‌চি,—পৃথিবীতে সত্যিই যদি কোন সর্ব্বশক্তিমান বিচারক থাকেন, তবে তোমার হারানো দেবতা আবার তোমার কাছে ফিরে আস্‌বেন!"

মুকুল অত্যন্ত ম্লান হাসি হাস্‌লে,—হায়, এ অসম্ভব স্বপ্নের কথা সেও তো কতবার ভেবেছে, কিন্তু ত্রিভুবনের কোথাও তো দেবতার সাড়া পায়নি!

সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে চারিদিক আব্‌ছায়ার মত হয়ে উঠ্‌ছে—দূর মাঠ থেকে ঘরমুখো গাভীর ডাক অনেকক্ষণ থেমে গেছে। শূন্যে

চাঞ্চল্যের আন্দোলন তুলে হাঁস-বকের ঝাঁক আর উড়ে যাচ্ছে না, কুয়াশার ভিতর থেকে পরেশনাথের মন্দির-মুকুটও আর চোখের উপরে ছবির মত ভাস্‌ছে না।

মুকুলের হাত ধ'রে টেনে তুলে নলিনী বল্‌লে, "ও ভাই আম্‌লকি! আজ যে চাঁদ উঠ্‌বে না, চল্ চল্ পালাই চল্!"

দুজনে তাড়াতাড়ি বনের পথ ধ'রে ঘরের দিকে চল্‌ল। মুকুল বল্‌লে, "পথেই হয়ত লাঠি-ঘাড়ে আলো দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে!"

নলিনী বল্‌লে, "তোমার মুখে যা শুন্‌লুম, তাতে আমারও ইচ্ছে হচ্চে, তোমার এই আলো দাদার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নি! আশ্চর্য্য, মানুষ এমন দেবতা! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত!"

বাংলোর কাছে এসে মুকুল বল্‌লে, "কাল আস্‌বে তো?"

নলিনী বল্‌লে, "আচ্ছা ভাই, এ তোমার ভারি অন্যায় আব্দার কিন্তু। আমিই কি রোজ তোমাদের বাড়ীতে আস্‌ব, তুমি কি একদিনও আমাদের বাড়ীতে যাবে না?"

—"কই, কোনদিন যেতে তো বলনি!"

—"বটে, এত-বড় কথা! আচ্ছা, এই আমি নেমন্তন্ন কর্‌লুম"—

ব'লেই সুর ধর্‌লে—

"যেও সখি, যেও যেও!
শিষ্টি-ভাবে পাত্‌টি পেতে
মিষ্টিমুখে মিষ্টি খেও!"

—"একেবারে মিষ্টিমুখ!"

—"তাতে হয়েচে কি, তুমিও না-হয় একদিন শোধবোধ ক'রে দিও। কেমন, যাবে তো ভাই আম্‌লকি?"

—"আচ্ছা ভাই আম্‌লকি!"

পাঁচ

রোদ যখন পড়ে-পড়ে, একজন দ্বারবানের সঙ্গে মুকুলমালা সখীর নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে বেরুল।

নলিনী তার অপেক্ষায় রাস্তাতেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখেই ছুটে এসে হাত ধ'রে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। একবার তার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "একি ভাই আম্‌লকি! এসেচ নেমন্তন্নে, একটু সেজেগুজে আস্‌তে হয়!"

মুকুল কাতর স্বরে বল্‌লে, "যেদিন চিতায় উঠ্‌ব, সেইদিন খুব ভালো ক'রে সাজ্‌ব। তুমি দেখ্‌তে যেও!"

নলিনী তার গা-টিপে দিয়ে বল্‌লে, "মাইরি! কিন্তু অতদিন তো সবুর ক'রে আমি থাক্‌তে পার্‌ব না—তার আগেই আমি—

সাজাবো লো সাজাবো!
তোমার মতন এঁচোড়পাকার
পক্ক ঘুঁটি কাঁচাবো!
সোনা না-পাই, পুঁতির মালা,
গালার চুড়ি, কাঁচের বালা,
আর নাসা-রন্ধ্রে ঝুলিয়ে নোলোক
বিজয়-ঢোলোক বাজাবো!

কী আমার যৌবনে-যোগিনী এলেন গো, ও-চালাকি আমার সঙ্গে চল্‌বে না!"

মুকুল হেসে বল্‌লে, "আমাকে জোর ক'রে সাজালে তোমার ক'টা পা বেরুবে আম্‌লকি? চারটে?"

মুকুলের সেই দুষ্ট প্রশ্ন শুনে নলিনী একটা লাগসৈ জবর জবাব খুঁজ্‌ছে, এমন সময়ে খোকা নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরের ভিতরে এসে ঢুক্‌ল। মুকুল তাকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে বল্‌লে, "খোকার কি নাম রেখেচ ভাই?"

—"নামের কথা আর বোলো না। ওর খুব একটা জম্‌কালো আর নতুনতরো নাম রাখ্‌ব ব'লে প্রায়ই আমরা 'প্রকৃতিবাদ অভিধান' খুলে বসি, কিন্তু কোন নামই পছন্দ হচ্চে না! ভালো নাম সব পুরণো, আর নতুন নাম সব আড্য-আঢ্য-তাড্য গোছের!"

খোকা বল্‌লে, "মা বাবা দাকে—"

নলিনী বল্‌লে, "কর্ত্তা আবার ডাকে কেন? আমি এখন যেতে-টেতে পার্‌ব না বাপু, আস্‌তে হয় এখানেই আস্‌তে বল্‌গে যা!"

মুকুল ব্যস্তভাবে বল্‌লে, "না আম্‌লকি, কর্ত্তার আর এখানে এসে কাজ নেই, তুমিই যাও!"

—"তাও কি হয়, কর্ত্তার সঙ্গে আজ যে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব! আমার নতুন বন্ধুকে তিনি বুঝি দেখ্‌বেন না?"

—"ওমা, ওকি কথা! তাহ'লে এখুনি আমি পালাব!"

—"ওমা, ও-বাবা বল্‌লেই কি পার পাবে? এই আমি দরজা আগ্‌লে দাঁড়ালুম, পালাও না দেখি!"

মুকুল গম্ভীর মুখে বল্‌লে, "না, এ-রকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।"

—"তোমার ভালো লাগে কিনা পরে তা বোঝা যাবে। আমি তোমার কথা সব তাঁকে বলেচি, তিনি যে তোমাকে দেখ্‌তে চেয়েচেন!" —ব'লেই উচ্চস্বরে ডাক্‌লে, "ওগো, আমার আম্‌লকিকে দেখ্‌বে তো শীগ্‌গির এস!"

নলিনীর স্বামী যেন বাইরে প্রস্তুত হয়েই ছিল, স্ত্রীর ডাক্ শুনেই ঘরে এসে ঢুকে পড়্‌ল।

মুকুল কিন্তু তার আগেই উঠে ঘরের কোণে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে,—মুখে তার একহাত ঘোম্‌টা!

নলিনী বল্‌লে, "এই আমার বন্ধু শ্রীমতী আম্‌লকি,—ভালো নাম মুকুলমালা! ও আম্‌লকি, ঘোম্‌টা খোলোনা ভাই, সোনাপানা মুখখানি একবার দেখাও তো! ও আম্‌লকি—শুনচ?"

নলিনীর এই অভাবিত আচরণে মুকুলমালার আগা-পাশ-তলা জ্বলে উঠ্‌ল—এ কি লজ্জা, এ কি অপমান!

নলিনী বল্‌লে, "এখনো কথা শুন্‌লে না! কিন্তু হুকুম দিলে আমার কর্ত্তাটি যে এখুনি জোর ক'রে তোমার ঘোম্‌টা খুল্‌বেন, তার খবর রাখো?"

মুকুল ছবির মত স্থির।

—"তাহ'লে ওগো, পারো তো আমার বন্ধুর সঙ্গে তুমি পরিচয় কর—আমি চল্‌লুম।"

মুকুল আচ্ছন্নের মত শুন্‌লে, দুম্ ক'রে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে শিক্‌লি দেওয়ার শব্দ হোলো! তার বুকটা ভয়ে ধুক্‌পুক্ ক'রে উঠ্‌ল! সে বুঝ্‌লে, এ আবার এক নূতন চক্রান্ত! তবে কি নলিনী গেরস্তের বউ নয়—সে কি কোন ছদ্মবেশী বারনারী, এম্‌নি ক'রে শিকার ধরে?

হঠাৎ তার মনে পড়্‌ল, সে দ্বারবানকে সঙ্গে এনেছে! চীৎকার ক'রে তাকে ডাক্‌তে গেল, নলিনীর স্বামী কিন্তু বাধা দিয়ে বল্‌লে, "মুকুল, ভয় পেও না!"

বিদ্যুতের মত মুকুল মুখের ঘোম্‌টা তুলে ফেল্‌লে, বিস্ফারিত চোখে চকিত স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—"তুমি!"

—"হ্যাঁ, আমি নীতিশ।"

মুকুল একটা অস্ফুট ধ্বনি ক'রে ঘুরে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়্ল। ······তার স্বামী!

·········যখন তার জ্ঞান হোলো, চোখ খুলে দেখ্‌লে, স্বামীর কোলে মাথা দিয়ে সে শুয়ে রয়েছে, আর তার পাশে ব'সে উদ্বিগ্ন-মুখে নলিনী তাকে হাত-পাখায় বাতাস কর্‌ছে!

স্বপ্ন, স্বপ্ন,—সবই স্বপ্ন! এমন স্বর্গের স্বপন পাছে ভেঙে যায়, সেই ভয়ে আবার সে চোখ মুদে ফেল্‌লে।

নীতিশ বল্‌লে, "মুকুল, চোখ চাও!"

নলিনী বল্‌লে, "শিয়রে দেবতা, এখনো কি তোমার ভয় গেল না ভাই?"

তবে তো এ মিথ্যা নয়! মুকুল আবার চোখ খুলে গম্ভীর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে।

নীতিশ আস্তে আস্তে তাকে তুলে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "এখন কি একটু ভালো বোধ কর্‌চ?"

মুকুল বিহ্বলের মত বসে রইল—অন্তরের উচ্ছ্বসিত আনন্দ তার দু-চোখ দিয়ে অশ্রু হয়ে ঝ'রে ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

নীতিশ বল্‌লে, "তোমার সব কথা আমি নলিনীর মুখে শুনেচি। অমন ভয় পেয়ে আমার দিকে চেও না—তোমার কোন ভয় নেই, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করেচি।"

মুকুলের কান্না আরো বেড়ে উঠ্‌ল।

নীতিশ ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগ্‌ল, "কিন্তু আমার কথা তুমি শোনোনি। তাই আগেই আমি সব কথা তোমাকে বল্‌তে চাই। আমি যে তোমাকে কত ভালোবেসেচি, তুমি নিশ্চয়ই তা জানো। বন্ধুরা তাই আমাকে

'স্ত্রৈণ' ব'লে ডাক্‌ত। তুমি ছাড়া আমার জগতে আর কেউ ছিল না। কিন্তু যে-দিন হঠাৎ তুমি অদৃশ্য হ'লে, সেদিন আমার ভালোবাসায় যে কত-বড় আঘাত লেগেছিল, তা আর তোমাকে ব'লে বোঝাতে পার্‌ব না। সমস্ত জগৎ আমার চোখে ছোট হয়ে গেল—আমি যে তখন আত্মহত্যা করিনি, সেইটেই আশ্চর্য্য! লজ্জায়-ঘৃণায়-অপমানে আমি ঠিক পাগলের মত হয়ে গেলুম। কারুকে কিছু না ব'লে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। দিক-কতক উদ্দেশ্যহীনের মত নানা দেশে ঘুরে বেড়ালুম। ভেবেছিলুম এ-জন্মটা এম্‌নি ক'রেই কেটে যাবে। কিন্তু সে ভাবও বেশীদিন রইল না—মানুষের মন যে কি হাল্‌কা জিনিস, আমার জীবনেই তার পরিচয় পেয়েচি। সব কথা এখন খুলে বল্‌তে পার্‌ব না—পরে তোমাকে বল্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। এখন খালি এইটুকু শুনে রাখ যে, এলাহাবাদে আমি এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলুম, সেইখানেই নলিনীকে প্রথম দেখি। নলিনীর বাপ-মা নেই, খুড়োর বাড়ীতে সে থাক্‌ত। তার বিয়ের বয়স হয়েছিল অনেকদিন, কিন্তু যার বাপ-মা নেই, টাকাকড়ি কিছুই নেই,—তাকে বিয়ে করে কে? খুড়োরও অবস্থা ভালো নয়। নলিনীকে আমিই বিয়ে কর্‌লুম—কতকটা তার অসহায় অবস্থা দেখেও বটে, কতকটা তার রূপে মুগ্ধ হয়েও বটে। হয়ত তুমি ভাব্‌চ, এটা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে। বোধহয় তাইই। কিন্তু আমার স্বপক্ষে এইটুকু বল্‌বার আছে যে, তখন তোমাকে আবার পাবার আশাও আমার ছিল না, আর তেমন আশা করাও তখন আমি পাপ ব'লে ভাবতুম।"

মুকুল সমস্ত শুনে স্তব্ধ হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল। তার পর মৃদুস্বরে বল্‌লে, "আমার ছেলে?"

খোকার দিকে দেখিয়ে দিয়ে নীতিশ বল্‌লে, "ঐ তোমার ছেলে।

বছরখানেক আগে ওকে কল্‌কাতা থেকে আনিয়েচি। নলিনী ওকে নিজের ছেলের চেয়ে কম যত্নে মানুষ কর্‌চে না।"

মুকুল খোকাকে টেনে নিজের বুকের উপরে চেপে ধর্‌লে। ব্যথিত স্বরে স্বামীর উদ্দেশে বল্‌লে, "তুমি যা করেচ—বেশ করেচ। আমি তোমাকে দুষ্‌চি না—সে অধিকারও আমার নেই। কিন্তু তুমিই ব'লে দাও, এখন আমি কি কর্‌ব?"

নীতিশ কিছু বল্‌বার আগেই নলিনী ব'লে উঠ্‌ল, "শোনো কথার ধরণ্‌টা! কর্‌বে আবার কি, সতীনের সঙ্গেই এখন সংসার কর্‌তে হবে! ভাগ্যে আমার সতীন আছে, কে তা খণ্ডাবে বল! তবে আম্‌লকি-দিদির মতন সতীন পেলুম, এইটুকুই যা সান্ত্বনা!"

মুকুল, নীতিশের দিকে চাইলে। তার মুখ দেখে মনে হয়, সে যেন শুন্‌তে চায়, বিচারক তার প্রতি কি দণ্ডবিধান কর্‌বেন!

নীতিশের মুখ লজ্জা-সঙ্কোচে কেমনতরো হয়ে উঠ্‌ল। থেমে থেমে সে বল্‌লে, "একালে এক স্বামীর দুই স্ত্রী, এটা যে একটা মস্ত কলঙ্কের কথা, আমি তা জানি। অথচ তোমাকে বিনাদোষে ত্যাগ করাও আমার পক্ষে মহাপাপ। এমন অবস্থায় নলিনী যা বল্‌লে, তা ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখ্‌চি না। তবে এতে যদি তোমার আত্মসম্মানে বাধে, তাহ'লে তোমার স্বাধীন ইচ্ছাতেও বাধা দেবার মুখ আমার নেই—যদিও তোমাকে আমি ঠিক আগেকার মতই ভালোবাসি।"

নলিনীর মুখে অন্ধকারের ছায়া পড়্‌ল—স্বামীর এই শেষ কথা শুনে। কিন্তু সে ছায়া ক্ষণিকের জন্যে। আপনার দুর্ব্বলতা তখনি দমন ক'রে মুকুলের পিঠ ধ'রে এক নাড়া দিয়ে সে বল্‌লে, "কথা কওনা গো আম্‌লকি-দিদি! বোবা হ'য়ে এখন ব'সে থাক্‌লে তো চল্‌বে না! বল, তোমার মত কি? সতীনের ঘর কর্‌বে কি কর্‌বে না?"

নীতিশের দুই পায়ের উপরে হুম্‌ড়ি খেয়ে প'ড়ে মুকুল ব'লে উঠ্‌ল, "আমার কোন মত নেই গো, আমার কোন মত নেই! তোমার এই পায়ের তলায় যেন জন্ম জন্ম থাক্‌তে পাই। এ পা ছেড়ে আমি স্বর্গে যেতেও চাই না!"

নলিনী বল্‌লে, "তুমি যে ও পায়ের তলা ছাড়্‌তে চাইবে না, তা আমি আগেই জানি। কিন্তু আমার জন্যেও যে ওখানে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিতে হবে দিদি!"

মুকুল মুখে কিছু বল্‌লে না, কিন্তু নলিনীর একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে প্রাণপণে চেপে ধর্‌লে, তার প্রাণের সমস্ত প্রেম আর কৃতজ্ঞতা যেন সেই আন্তরিক স্পর্শের মৌন ভাষায় নলিনীর কাছে আত্মপ্রকাশ কর্‌লে।

নলিনী বল্‌লে, "কিন্তু দেখো ভাই, শেষটা বরের পা নিয়ে যেন দীনবন্ধুর নাটকের দুই-সতীনের মত ঝগ্‌ড়া না বাধে! ঝগ্‌ড়া-টগ্‌ড়া আমি কর্‌তে পার্‌ব না—আমি হচ্ছি গাইয়ে মানুষ, চ্যাঁচালেই গলা খারাপ হয়ে যাবে কিনা! তবে তোমার যদি কখনো আমার ওপরে বড্ড বেশী রাগ হয়, আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করতে সাধ হয়, তবে এইটুকু খালি মনে রেখো যে, আমি না থাক্‌লে ঐ পায়ের তলা তুমি পেতে না! ভাগ্যে আমি এসে ওঁকে খবর দিলুম, তাই তো! হুঁ, বুঝেচ আম্‌লকি-দিদি, এ বাহাদুরিটুকু আমি কিন্তু ছাড়্‌তে রাজি নই!"

নীতিশ চিন্তিত মুখে বল্‌লে, "মুকুল, মুকুল! তোমায় ফিরিয়ে পেলুম, কিন্তু তবু তো আমার মন আনন্দে ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌চে না! খালি ভয় হচ্ছে, সমাজ কি বল্‌বে!"

নলিনী ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, সমাজের নিকুচি করেচে; নির্দোষীর প্রাণ নিয়ে সে এম্‌নি নিষ্ঠুর খেলা খেল্‌বে, আর তাই বুঝি বসে বসে

দেখ্‌তে হবে? ভারি যে আব্দার! আর তুমিই বা কেমন মানুষ গা, কাল সারা রাত ধ'রে এত যে বোঝালুম, তবু তোমার ভয় ভাঙ্‌ল না? পুরুষ হয়ে জন্মেচ কি কর্‌তে?"

—"থাকো পশ্চিমে, সমাজের কথা জান্‌বে কি ক'রে নলিনী?"

—"তাহ'লে এক কাজ কর। আম্‌লকি-দিদির আলো-দাদার সব কথা শুনেচ তো? চল, আমরাও তাঁর আশ্রয় নিই-গে। তাঁরও আশ্রমের সাহায্য হবে, আর তাঁর শক্ত হাত আমাদেরও রক্ষা কর্‌বে!"

—"মিছে নয়, এ-বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌লে মন্দ হয় না। আর তাঁকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমাদের কর্ত্তব্যও তো বটে!"

* * * *

বাংলোর বারান্দায় একটি 'টেপয়ে'র উপরে হারিকেনের ল্যাম্প জ্বল্‌ছে, আর তারই সুমুখে ব'সে ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে, আলোকনাথ সমাজ-তত্ব সম্বন্ধে একখানা ইংরেজী বই পড়্‌ছে।

হঠাৎ মুখ তুলে দেখে, মুকুল একটি অচেনা পুরুষের হাত ধ'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বারান্দায় এসে উঠ্‌ল! তাদের পিছনেই আর একটি তরুণী! নির্ব্বাক বিস্ময়ে আলোকনাথ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাদের পানে চেয়ে রইল।

মুকুল বল্‌লে, "এই আমার আলো দাদা!"

নীতিশ এগিয়ে নমস্কার ক'রে বল্‌লে, "আপনার নাম শুনে দেখা কর্‌তে এসেচি। আমাকে আপনি চেনেন না, আমার নাম নীতিশচন্দ্র মজুমদার।"

নীতিশচন্দ্র মজুমদার! এ নাম আলোকনাথ খুব চেনে। কিন্তু শুনেও সে কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না, অত্যন্ত সন্দেহের সঙ্গে অস্ফুটস্বরে বল্‌লে, "আপনি কি—"

—"মুকুলের স্বামী। মুকুলকে আমি দাবি কর্‌তে এসেচি!"

বিপুল পুলকে একলাফে আলোক দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল—হাতের বইখানা ছুঁড়ে বাগানের ভিতরে অনেক দূরে ফেলে দিলে—লাথি মেরে ইজি-চেয়ারখানা তিনহাত তফাতে সরিয়ে দিলে, কিন্তু তবু তার আনন্দ তৃপ্তি মান্‌ল না—আচম্বিতে নীতিশের ছোটখাটো দেহটিকে দু হাতে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ধ'রে সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "নীতিশবাবু ভয় পাবেন না, এ হচ্ছে আমার আনন্দ! আমি আপনাকে লুফ্‌ব!" ব'লেই সে নীতিশকে বার-কতক বলের মত শূন্যেই লুফে নিলে!

নীতিশ অসহায় ভাবে হাত-পা ছুঁড়ে ছট্‌ফট্ করতে করতে চোখ কপালে তুলে বল্‌লে, "রক্ষে করুন, রক্ষে করুন,—আর আমাকে নিয়ে আনন্দ কর্‌তে হবে না—গেলুম যে!"

আলোক তখন নীতিশকে ছেড়ে দিলে।

নীতিশ হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, "এই যদি আপনার আনন্দ হয় আলোকবাবু, তাহ'লে রাগ্‌লে আপনি কী করেন?"

আলোকনাথ মুকুলের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "বোন, তোমাকে বলিহারি, তোমার বাহাদুরি আছে বটে! এই বিষম বন-জঙ্গল পাহাড়ের কোত্থেকে আমার ভগ্নীপতিটিকে সংগ্রহ ক'রে আন্‌লে শুনি। দেখো, ভুল-টুল হয়-নি তো?"

কৃত্রিম কোপ-কটাক্ষে মুকুল বললে, "স্বামী ভুল! কি যে বল তার ঠিক নেই আলো দাদা! স্বামী কি পাঠশালার অঙ্ক, যে দু-চার বৎসর না-কষ্‌লেই ভুলে যাব?"

—"তবে কি উনি সন্ন্যাসী হয়ে গিরিগুহায় বসে কঠোর তপস্যা কর্‌ছিলেন?"

স্বামীর দিকে একবার চেয়ে, মুখ টিপে হেসে মুকুল বললে, "ঠিক তার উল্টো। কিন্তু সে সব পরে শুনো। এখন আগে দিদির কাছে

যাই। আয় আম্‌লকি!" এই ব'লে সে নলিনীর হাত ধ'রে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

নীতিশ বল্‌লে, "আলোকবাবু, মুকুলের জন্যে আপনি যা করেচেন, সে ঋণ আমি কখনো শুধ্‌তে পার্‌বো না। মুখের ছুটো ধন্যবাদ দিয়েও—"

আলোকনাথ বাধা দিয়ে বল্‌লে, "ধন্যবাদ তো আমার দেওয়া উচিত! লোকে কন্যাদায়ের পড়ে, আমি পড়েছিলুম ভগ্নীদায়ে। সে দায় থেকে আপনি উদ্ধার কর্‌লেন। কত যে আপনাকে খুঁজেচি, তা আর কি বল্‌ব!"

—"সে সবই আমি শুনেচি। কিন্তু আমার আর একটি নিবেদন আছে। মুকুলের মুখ চেয়ে এতটা যখন করেচেন, তখন এটিও আপনাকে শুন্‌তে হবে।"

—"বলুন।"

—"আমি আর সমাজে ফিরতে চাই না।"

—"তবে কি কর্‌বেন?"

—"আপনার আশ্রমের তো অনেক কর্ত্তব্য আছে, বাকি জীবন আমি সেই কর্ত্তব্যে উৎসর্গ কর্‌তে চাই। হয়ত এতে আপনারও কিছু সাহায্য হবে। আপনার কি মত?"

খুসি হয়ে আলোকনাথ বল্‌লে, "এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা! একলা আমি সব দিক সাম্‌লাতে পারি না—আপনাকে আমি স্বাগত আহ্বান কর্‌চি। এম্‌নি ক'রে একে একে আমাদের দল যতই বাড়ে ততই মঙ্গল। সত্যি নীতিশবাবু, আপনার প্রস্তাবে আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠ্‌চে।" আলোক হাত বাড়িয়ে নীতিশের হাতটা একবার নেড়ে দিতে গেল।

কিন্তু সতর্ক নীতিশ ভয়ে তিন পা পিছিয়ে নাগালের বাইরে গিয়ে বল্‌লে, "আপনার আনন্দের বেগ সংবরণ করুন! এবার লুফ্‌লে আর বাঁচ্‌ব না!"

আলোকনাথ হা হা ক'রে হেসে চারিদিক কাঁপিয়ে তুল্‌লে!

ছয়

ভোরবেলা। কাক-পক্ষীর সাড়া নেই। ধরণীর মুখের ঘোমটা একটু একটু ক'রে খসে পড়ছে, বর্ণ-বিচিত্র বুকের ছবি একটু একটু ক'রে ফুটে উঠছে। আকাশের অঞ্চল-প্রান্তে কে যেন রঙিন পাড় এঁকে দিচ্ছে—চারিদিকে এখনি যে বিপুল জাগরণের চপলতা সঞ্চারিত হয়ে যাবে—এ-সব তারই প্রথম আভাস। সৃষ্টির প্রভাত থেকে আজ পর্যন্ত এমন প্রথম আভাস কত কোটি কোটি বার জেগেছে, তা ভেবে দেখলেও স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।·········সেই কোটি কোটি প্রভাত প্রতিদিন বিশ্ব-মানবকে ডাক দিয়ে বলেছে—"মানুষ, জাগো, জাগো!" কিন্তু সত্যিই কি মানুষ জেগেছে?

রাধারাণী প্রতিদিনের মত আজকেও সকালের বাতাসে একটু বেড়াবার জন্যে ঘর থেকে বাইরে বেরুল। আলোকের ঘরের সামনে দিয়ে সে যখন যাচ্ছে, ভিতর থেকে আলোকের স্বর এল—"কে, রাধারাণী?"

—"হ্যাঁ।"

—"ভেতরে এস। কথা আছে।"

রাধারাণী ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলে, জানলার কাছে একখানা চেয়ারের উপরে আলোক ব'সে আছে।

—"আলোকবাবু, আজ যে আপনি এত সকালে উঠেছেন?"

—"তোমার অপেক্ষায় বসেছিলুম।"

—"কেন আলোকবাবু?"

—"মুকুলের সম্বন্ধে তো নিশ্চিন্ত হলুম। একটা কঠোর কর্ত্তব্যের ভার ঘাড় থেকে নেমে গেল।"

—"হ্যাঁ।"

—"এখন তুমি কি কর্‌বে?"

—"যা কর্‌চি।"

—"আশ্রমের সেবা? কিন্তু তা ছাড়া জীবনের আর কোন কামনাই কি তোমার নেই?"

রাধারাণী আলোকের চোখের উপরে স্থির দুটি চোখ রেখে বল্‌লে, "আপনার কথা আমি বুঝতে পার্‌চি না।"

আলোক দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে খানিকক্ষণ ভাব্‌লে। তার পর ধীরে ধীরে বল্‌লে, "শোনো রাধারাণী! কি পুরুষ আর কি নারী, কেউই একলা থেকে সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। পুরুষের কতকগুলি গুণ নারীর নেই, আবার নারীর কতকগুলি গুণ পুরুষের নেই। তাই নিজের নিজের অভাব পূর্ণ কর্‌বার জন্যে, জীবনের যাত্রা-পথে তারা পরস্পরের সঙ্গী না হয়ে পথ চল্‌তে পারে না। এই অভাববোধ থেকে যে আকাঙ্ক্ষার জন্ম, তা থেকেই নর আর নারী স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয়। এইজন্যেই শাস্ত্র পুরুষকে উপদেশ দিয়েচে, ধর্ম্মপথে সস্ত্রীক চল্‌তে। সব-বিষয়ে পিছনে রেখেও, শাস্ত্রকার এখানে নারীকে বর্জ্জন কর্‌তে পারেন নি। নারীরও একজন পুরুষ সহগামী না হ'লে চলে না। তার প্রধান অভাব, সে দুর্ব্বল। পুরুষ তার সে স্বাভাবিক অভাব পূর্ণ করে। মুকুল তার সঙ্গীকে ফিরিয়ে পেয়েচে, কিন্তু তুমি কি বরাবরই একলা থাক্‌বে?"

রাধারাণী মুখ নামিয়ে বেদনা-বিদীর্ণ স্বরে বল্‌লে, "আলোকবাবু, আপনি কি জানেন না, আমার যিনি সঙ্গী ছিলেন, বিয়ের পরে মাস না ঘুর্‌তেই, তাঁকে চেন্‌বার আগেই তিনি আমাকে পিছনে ফেলে চ'লে

গেছেন? তাঁর মুখও আমার মনে নেই, তাঁকে পাবারও আর কোন আশা নেই!"

আলোকনাথ বল্লে, "কিন্তু বিধবা-বিবাহ? তুমি বিদুষী, তোমার স্বাধীন চিন্তা কর্‌বার শক্তি আছে, আশা করি এদিকেও তোমার কোন কুসংস্কার নেই?"

—"কুসংস্কারের জন্যে নয়, কিন্তু বিবাহ আমি আর করব না!"

—"কেন?"

—"আমি কোন কারণ বল্‌তে চাই না।"

হতাশস্বরে আলোক বল্লে, "রাধারাণী, এ সংসারে আমার সব ছিল —অর্থ, যশ, বিদ্যা। এরই জোরে আর-পাঁচজনের মত আমিও দেশ ও দশের মধ্যে প্রধান হয়ে থাক্‌তে পার্‌তুম। কিন্তু সে সুযোগ আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেচি। সংসারে এক-হিসেবে আমার সব থেকেও কিছু নেই—আজ আমি বড় অসহায়। গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার মাথায় নিয়েচি, এখানে অন্তরে-বাহিরে কে আমাকে সাহায্য কর্‌বে?"

—"আমি!"

—"তুমি? কিন্তু তুমি কাছে থেকেও ছায়ার মত দূরে দূরে আছ, তোমাকে ধরি-ধরি করি তবু ধর্‌তে পারি না! হাতের কাছে দুর্লভকে নিয়ে আমি যে আর থাক্‌তে পার্‌চি না রাধারাণী!"

এতক্ষণে রাধারাণী সব বুঝ্‌তে পার্‌লে। গভীর লজ্জায় তার কাণের গোড়া পর্য্যন্ত রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। শোনা-যায়-কি-না-যায় এম্‌নি স্বরে বল্লে, "থাক্, থাক্ আলোকবাবু, আর বল্‌বেন না—আর বল্‌বেন না!"

কিন্তু আলোকের বুকে তখন আবেগের বান ডেকে উঠেছে—তার গতি তো আর বন্ধ হবার নয়! উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ ভ'রে সে বল্লে, "হ্যাঁ আমি বল্‌ব, বল্‌ব, বল্‌ব—কেন বল্‌ব না? এতদিন মুকুলের দুর্ভাগ্যে আমার

মুখ বোবা হয়ে ছিল, কিন্তু আজ আমি আমার স্বরকে আবার ফিরিয়ে পেয়েচি—আজ আর আমি কোন কথা লুকোব না—আজ তুমি শুনে রাখো রাধারাণী, আমি তোমাকে ভালোবাসি! এ প্রেম আমার সমুদ্রের মতই অগাধ, সমুদ্রের মতই প্রবল—তুমি কি একে রোধ কর্তে পার্বে?"

ধপ্ ক'রে ঘরের তলায় ব'সে পড়ে, রাধারাণী দু-হাতে আপনার ছাইয়ের মত সাদা মুখ ঢেকে ফেল্লে।

আলোকনাথ তেম্‌নি স্বরেই সমান ব'লে যেতে লাগ্‌ল, "আমি জানি, তুমি নিজেকে লুকোতে চাও! কিন্তু এও জানি যে, তুমি আমাকে ভালোবাসো! তোমার মন না দেখে আমিও তোমাকে ভালোবাসিনি! তোমার মুখ-চোখ, তোমার শন্ত ব্যবহার, তোমার আদর-স্নেহ-যত্ন এ সবই আমার কাছে তোমাকে প্রকাশ ক'রে দিয়েচে। হ্যাঁ, আমি জোর ক'রে বল্‌চি, তুমি আমাকে ভালোবাসো!"

রাধারাণী কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কেঁদে ফেলে বল্লে, "আলোকবাবু, আলোকবাবু, আপনি কি আমাকে পাগল ক'রে দিতে চান?"

আলোকনাথ এগিয়ে গিয়ে দু-হাতে রাধারাণীকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারপর তার ত্রস্ত, সজল চোখের উপরে আপনার জ্বলন্ত দৃষ্টি রেখে দৃঢ় স্বরে বল্লে, "আর-একজনকে আমি ভালো বেসেছিলুম,—সে মঞ্জরী। উন্মুখ যৌবনে পুরুষ প্রথম যে নারীর সংস্পর্শে আসে, তাকেই ভালোবেসে ফেলে। সে নেশা দুদিনেই ছুটে যায়—আমারও গেছে। কিন্তু আমার আজ্‌কের এ গভীর ভালোবাসার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। রাধারাণী, আমি তোমাকে বিবাহ কর্‌ব।"

—"না—না—আমি বিধবা।"

—"বলেচি তো, ও-সংস্কার আমাকে বাধা দিতে পার্বে না!"

—"কিন্তু, আমি—আমি—পতিতা।"

—"কখনো নয়! অভিধানে পতিতার যে মানে আছে, সকলের পক্ষে তা খাটে না। তুমি সমাজের পায়ের ধূলো বটে, কিন্তু তোমাকে মাথায় তুলে নেবার শক্তি আর সাহস আমার আছে! তুমি সতী, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি!"

—"আলোকবাবু, আমি যে আপনার জাতিও নই! সমাজে তাহ'লে যে কোনদিনই আপনি ঠাঁই পাবেন না! পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দিন —আমার জন্যে কেন নিজের সর্ব্বনাশ করবেন?"

আলোকনাথ হা হা ক'রে হেসে বল্লে, "কার কাছে সমাজের কথা তুলচ রাধারাণী,—এই বেপরোয়া, বিদ্রোহী সমাজের কে তোয়াক্কা রাখে? অত্যাচারী, অন্ধ, নির্ম্মম সমাজের আশ্রয়ে আমি থাকতে চাই না! আর এও তো তোমার জানতে বাকি নেই যে, আজ আমি লম্পট ব'লে নিন্দিত, রাজদণ্ডে দণ্ডিত, কুকুরের মত সমাজ থেকে তাড়িত! আমার আবার সমাজ! জাতি-ধর্ম্ম আমার যে একেবারে ব্যর্থ! তুমি যদি পতিতা হও, তবে আমিও যে পতিত! কিন্তু পতিতকে পতিতাও তাড়িয়ে দিলে তার কি হবে রাধারাণী?"·········আলোকের দুই নেত্র দিয়ে হৃদয়-বর্ষার ঝরো-ঝরো ধারা বইতে লাগল!

রাধারাণী আর কোন কথা বলতে পারলে না—আকুল চোখে সে আলোকে মুখের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে রইল—কিন্তু তার প্রাণের বন্দী ভাষা যেন অবাধ তোড়ে বুক ফেটে বাইরে বেরিয়ে বলতে চাইলে—'ওগো তুমি কেঁদনা, ওগো তুমি কেঁদনা,—আমি তোমার, তোমার, তোমার,—আজ থেকে আমি তোমার গো তোমার!'

আলোক গাঢ়স্বরে বল্লে, "এস রাধারাণী, আজ থেকে আমরা নূতন পথে নূতন ভাবে আবার নূতন জীবন আরম্ভ করি! সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর অতীতের কাল-সাগরে ডুবে গেছে—হাজার হাজার বৎসরের জরায় প্রাচীন

সমাজ জর্জ্জর হয়ে উঠেচে, অন্ধকারের কোণ ছেড়ে তার অথর্ব্ব দেহ এত দূরে—এই উদার হাওয়ার মুক্ত প্রান্তরে এসে পৌঁছোতে পারবে না; তার বধির কর্ণ মহামানবের সাগর-তটে বহুর মধ্যে একের বিজয়-স্তোত্র শুনতে পারবে না; তার স্তিমিত দৃষ্টি বিশ্বের আকাশে নব-যুগের এই জলন্ত সূর্য্যের দীপ্তিকে সইতে পারবে না! থাক্ বুড়ো আঁধারেই শুয়ে থাক্,—নব-প্রভাতের তরুণ সন্তান আমরা, কেন সেখানে ভিড় বাড়িয়ে আমরা তার অন্তিমের শান্তিকে নষ্ট করব?·········এস তবে সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে,—যেখানে আলো-বাতাস আছে, যেখানে জীবনের যৌবনের হিল্লোল আছে, যেখানে পবিত্র মনুষ্যত্ব নিবিড় পঙ্কেও অস্পৃশ্য নয়, যেখানে এক জাতি, এক সমাজ, এক ধর্ম্ম ভেদাভেদের গণ্ডী নিঃশেষে মুছে দিয়েছে! মানুষের জন্যে মনুষ্য-সমাজ গ'ড়ে তোলো, নব-যুগের নব-শাস্ত্র রচনা করো! দেবতার যুগ গত,—এ হচ্ছে দোষে-গুণে গড়া মানুষের যুগ!"

রাধারাণী পাথরের মত নিসাড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ দেখ্‌লে মনে হয়, প্রাণের কি-একটা অবোলা যন্ত্রণার ছট্‌ফটানি যেন সে প্রাণপণ চেষ্টায় বন্ধ করতে চেষ্টা পাচ্ছে।

আলোক বল্‌লে, "বল রাধারাণী, তুমি কি আমাকে বিবাহ করবে?"

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে রাধারাণী ব'লে উঠ্‌ল, "না!"

—"তবে কি তুমি আমাকে ভালোবাসো না?"

বড় কষ্টে, থেমে থেমে রাধারাণী বল্‌লে, "বাসি, বাসি, ভালোবাসি! স্বর্গের মত আপনাকে ভালোবাসি—ঈশ্বরের মত আপনাকে ভালোবাসি! কিন্তু বিবাহ·········আপনাকে বিবাহ? অসম্ভব!"

আলোকনাথ আশ্চর্য্যস্বরে বল্‌লে, "এ তোমার কি-রকম ভালোবাসা রাধারাণী!"

চোখের জলে মুখ, গলা, বুক ভাসিয়ে রাধারাণী বল্‌লে, "আলোকবাবু, আলোকবাবু, আমার কথা শুনে আপনিও আশ্চর্য্য হলেন? তবে কি আর-সকলের মত আপনিও আমার এই মাংসপিণ্ডে গড়া হীন দেহটারই প্রত্যাশী? পুরুষকে আমি ঘৃণা করি—তারা আমার মন দেখে না, আমার দেহটাকে নিয়ে তারা কুকুর-শেয়ালের মত খেলা কর্‌তে চায়! আমার এই দেহকে আমি ঘৃণা করি! আপনিও কি—" রাধারাণীর স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

আলোকনাথের বুকের উপরে কে যেন সপাং ক'রে এক ঘা বেত বসিয়ে দিলে। বিবশ হ'য়ে আবার সে চেয়ারের উপরে ব'সে পড়্‌ল।

রাধারাণী বল্‌তে লাগ্‌ল, "আলোকবাবু, আপনি জানেন না, আমার মনের রাজ্যে কত উঁচু সিংহাসনে আপনাকে আমি বসিয়ে রেখেচি! আমার এই তুচ্ছ দেহটার জন্যে সেখান থেকে আপনি নেমে আস্‌বেন না আলোকবাবু, নেমে আস্‌বেন না! দেহের যৌবন পেয়ে প্রেম কি কখনো সুখী হ'তে পারে? এ যৌবন পালিয়ে গেলে কি নিয়ে আপনি আমাকে ভালোবাস্‌বেন বলুন আলোকবাবু!····দেহ আমাকে বড় দাগা দিয়েচে, মানুষের চোখে আমাকে বড় ছোট ক'রে রেখেচে! আর পাঁচ-জনের মত, আপনিও যদি নীচু হয়ে সেই দেহ নিয়েই ছেলেখেলা কর্‌তে চান, তবে দেবত্বের সে অপমান দেখ্‌বার আগেই আমি আত্মহত্যা কর্‌ব!"

আলোকনাথ মূক হয়ে ব'সে রইল—গভীর লজ্জায় রাধারাণীর মুখের দিকে আর মুখ তুলে চাইতেই পার্‌লে না। এই যে একটি নারীকে সমাজ আজ অস্পৃশ্য ব'লে চিরদিনের মত বিদায় ক'রে দিয়েচে, যার ছায়া মাড়ালেও সমাজের বড় বড় 'সাধু'দের মাথা আজ 'পাপে'র ভারে হেঁট্‌ হয়ে যাবে, আসলে সে যে কত বড়, পরিপূর্ণ নারীত্বে সে যে কি মহিমময়ী, এ সত্য আলোক আজ যেমন ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌লে, তেমন

আর কোনদিনই পারেনি। এরই কাছে সে কি ছোট জিনিসই চাইতে গিয়েছিল! মনে মনে নিজেকে বার-বার ধিক্কার দিয়ে, নীচের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে আলোক বল্লে, "রাধারাণী, আমার ভুল হয়েচে, আমার প্রাণের ভেতরে কোন্ পশু লুকিয়ে আছে, আমি তা জান্তে পারিনি!"

রাধারাণী বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লে, "আমার আত্মার যৌবন আপনার আশায় উন্মুখ হয়ে আছে—"

আলোকনাথ একটা পরম আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্লে, "তাই আমাকে দাও রাধারাণী, তাই পেলেই আমি বর্ত্তে যাব!" এতক্ষণ নিজের দীনতার মাঝখানে সে যেন আবার থই পেয়ে বাঁচ্‌ল। আসন ছেড়ে উঠে সে আবার রাধারাণীর সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত স্বরে বল্লে, "রাধারাণী, তোমার আত্মার অমর যৌবনই আজ থেকে আমার জীবনকে পবিত্র সার্থক ক'রে তুলুক! আমার ভুল ভেঙেচে, আর কখনো তোমার দেহকে চেয়ে মনুষ্যত্বকে আমি খাটো কর্‌ব না,—কিন্তু প্রভাতের ঐ সূর্য্য সাক্ষী, আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার জীবনের সহধর্ম্মিণী,—আমার প্রেমে তোমার অধিকার, তোমার প্রেমে আমার অধিকার!"

ভোরের ঘুম-ভাঙানো প্রথম বাতাস বনে বনে নাড়া দিয়ে ব'লে বলে গেল—'জেগে ওঠো বনস্পতি! জেগে ওঠো বনফুল! জেগে ওঠো তৃণাঙ্কুর!' গাছে গাছে ডানাঝাড়া দিয়ে পাখীরাও সব আলোকের অধিকারীরা, চোখ মেল, চোখ পুলক-সুর ধর্‌লে—জাগো জাগো ধরণীর সন্তানরা, জাগো জাগো আলোকের মেল, চেয়ে দেখ আলো আসে—আরো—আরো আলো!'

আলোর পরে আলোর ঢেউ! পূর্ব্ব-তোরণে উদয়-সূর্য্যের প্রকাশ—

যেন বিশ্ব-আত্মার সমুজ্জ্বল শিখা—নির্ম্মল, পবিত্র, আনন্দে আরক্ত, উৎসাহে প্রদীপ্ত !

নিষ্পলক-নেত্রে সেই জ্যোতির নির্ঝরের দিকে চেয়ে আলোক সমাধিগ্রস্ত মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ! রাধারাণী চেয়ে রইল আলোকের আলোকোজ্জ্বল মুখের দিকে—সে যেন ঠিক নব-প্রভাতের ঊর্দ্ধমুখী সূর্য্যমুখী !...... নূতন তপন, নূতন জীবন !

ইতি